বি. প্র. পর্য্যায়—১

ঘর ও পর



পর কে ? পরের পরত্ব ভুলিয়া গিয়া তাহাকে আপনার করিতে পারাই তো মনুষ্যত্ব, তাহাকে আপনার ভাবিতে শিখাই তো মুক্তি। মুক্তি আর সমদৃষ্টি একই কথা। মুক্তির আর কোন উদ্ভট মানে নাই।



শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বি. প্র. ভাণ্ডার

বসন্ত-কুটীর, গোন্দলপাড়া,

চন্দননগর।

১৩২৭

 [মূল্য এক টাকা মাত্র

বি. প্র. ভাণ্ডার

বসন্ত-কুটীর, গোন্দলপাড়া,

চন্দননগর।

মুখ্যতঃ সর্ব্ববিষয়ক বিদ্যা প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া বি. প্র. (বিদ্যা প্রচার) গ্রন্থাবলীর ও বি. প্র. ভাণ্ডারের সৃষ্টি। চরিত্র গঠনে সাহায্য করিতে পারে এরূপ গ্রন্থের প্রকাশভারও এই ভাণ্ডার লইয়া থাকেন।

এই ভাণ্ডার হইতে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সে সকলের প্রচারের জন্য নানা স্থানে 'এজেণ্ট' বা বিক্রেতা আবশ্যক। যাঁহারা এজেণ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমার সহিত সর্ত্তাদি সম্বন্ধে পত্রালাপ করিতে পারেন।

যাঁহারাই একসঙ্গে অন্ততঃ তিনখানি গ্রন্থ কিনিবেন, তাঁহারাই ভাণ্ডার হইতে শতকরা ৬৷৹ হিসাবে কমিশন বা দস্তুরী পাইবেন।

প্রত্যেক অর্ডারের সহিত মূল্যের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ পাঠাইতে হইবে। বাকি অংশ ভি-পি তে আদায় করা হইবে। যাঁহারা ভি-পি ফেরৎ দিবেন, তাঁহাদের জমা-দেওয়া অর্থ হইতে ভি-পির খরচ ও বাকি অর্থ পাঠাইবার খরচ কাটিয়া লওয়া হইবে।

পত্রাদি ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লেখা আবশ্যক।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ম্মকর্ত্তা।

ভুমিকা ।



এ পুস্তকে নূতন কথা কিছুই নাই। পুরাতন কথা নূতন
করিয়া বলিবার চেষ্টা মাত্র আছে। যাহাতে সকলে
পড়িয়া বুঝিতে পারে এজন্য ভাষা যতদূর সম্ভব
সহজ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর
সফল হইয়াছি তাহার বিচার
সাধারণের হাতে।



প্রকাশক
শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।

সাথী প্রেস
২৯ নং বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার
শ্রীহেমচন্দ্র রায়।

ঘর ও পর



(১)

ঘরের কথা বলিতে গেলেই পরের কথা আপনিই আসিয়া পড়ে। পর ছাড়া তো আর ঘর হয় না। আজ যে পর, কালই হয়ত সে ঘরের লোক হইয়া যায়। তাছাড়া সে একেবারে ঘরের লোক না হইলেও তাহাকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারি কি? যাহারা বনে জঙ্গলে বাস করে, তাহারাও পরকে লইয়া ঘর বাঁধে, সমাজ বাঁধে, সংসার পাতে। আর যাহারা লোকালয়ে থাকে, তাহাদের তো নিত্য আদান-প্রদান পরের সহিতই। পরকে তাহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও অস্বীকার করিতে পারে না। কেহ কখন একলা নিজের চেষ্টায় কেবল নিজেরও গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় করিয়া উঠিতে পারে না। বনের ফল খাইয়া ও গাছের পাতা পরিয়া কে থাকিতে পারে? সেরূপভাবে থাকিতে পারিলে সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার, মানুষ বলিয়া অহঙ্কার করিবার, কিছুই থাকে না। তাহা হইলে মানুষে ও বনমানুষে বড় বেশী প্রভেদ থাকে না। আমাদের প্র-প্র-প্র-পিতামহেরা এক সময়ে হয়ত সত্যসত্যই বনমানুষ ছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া বনমানুষের সহিত আত্মীয়তা স্বীকার করিতে,

তাহাদের আচার ব্যবহার নকল করিতে, আমরা আজ সম্মত কি ? কাহাকেও বনমানুষ বা বানর বলিলে সে তো এখন রাগিয়াই খুন হয়। আবার বানর বা বনমানুষেরাই কি পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে ? তাহাদিগকেও কি আত্মরক্ষার জন্য দল বাঁধিতে হয় না, দল বাঁধিয়া ঘুরিতে ফিরিতে হয় না ? তাহাদের মধ্যেও যে একলা, সে নিতান্তই অসহায়, বেশীদিন বাঁচিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়। নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বর যাহারা, তাহারাও দল বাঁধে, দল বাঁধিয়া বসবাস করে, কাযকর্ম্ম করে, আহারের যোগাড় করে। তাহাদেরও নিত্য কারবার পরের সহিত।

এই পরের সহিত আদান-প্রদান করিতে শিখিয়াই মানুষ ক্রমশ সভ্য-ভব্য হইতে শিখিয়াছে। তাহার শীলতাই বল, আর কর্ত্তব্যবোধই বল, সবই পরের সহিত সংস্পর্শের ফল। পর আছে বলিয়াই, পরকে ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়াই মানুষকে পরের মুখ চাহিয়া চলিতে হয়। পরকে সে খুসী রাখিতে বাধ্য। পরকে খুসী রাখিতে গিয়াই তাহাকে আত্মসংযম শিখিতে হইয়াছে, যাহা-তাহা করিবার অধিকার ও ক্ষমতা হইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে, সে সর্ব্বতোভাবেই পরের জীব বা সামাজিক জীব হইয়া উঠিয়াছে। সামাজিক জীবের স্বাধীনতা নাই। সে নিতান্ত পক্ষেই পরের রুচির অধীন।

পরকে মানুষ অমান্য করিতে পারে না। পরকে লইয়াই তাহার ঘর। যে গৃহিণীকে প্রাচীনেরা ঘর বলিয়া আদর

করিতেন, সেই গৃহিনীও তো পরই। সেই পরকে লইয়াই ঘরের সৃষ্টি। একলা কোন ঘরের সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং ঘর বলিলেই পরের কথা আপনিই আসিয়া পড়ে।

যাহারা ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছে, গহন বনে বসিয়া জপতপ করে ও গাছের পড়া পাতা বা ফল খাইয়াই দিন কাটায়, তাহাদের কথায় কায নাই। কারণ তাহাদের ঘরও নাই, কাজেই পরও নাই। সেই আত্মসর্ব্বস্বদিগের সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই। তাহারা পরের নুন খাইয়া, পরের সেবা লইয়া যখন সেবা করিবার মত বয়স ও শক্তি পাইয়াছে, তখনই পরকে অগ্রাহ্য করিয়া বনে পলাইয়াছে। তাহারা যত বড়ই 'সাধু' হউক, তাহাদের আমি প্রশংসা করিতে পারি না।

আমরা গৃহস্থ লোক—সংসারী মানুষ, পরকে লইয়াই আমাদের সব। যাহারা বনবাসী, তাহারা বনেই থাকুক, সেই বনের মাঝে নিজেকেই বড় করিয়া, সর্ব্বস্ব করিয়া দেখিতে ও ভাবিতে থাকুক; কিন্তু আমরা তো আর তাহা পারি না। আমরা যে প্রতি পদেই পরের প্রভাব বোধ করিতেছি; সুতরাং পরকে ছোট করিবার, তাহাকে অগ্রাহ্য করিবার মত দুঃসাহস আমাদের কোথায়?

প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা সাক্ষাৎভাবে ও পরোক্ষে পরের সম্মুখে আসিতেছি, পরের সাহায্য লইতেছি। এই যে কালি কলম লইয়া লিখিতে বসিয়াছি, ইহাও কি পরের সাহায্য বিনা

সম্ভবপর হইত ? আমার সাধ্য কি, আমি নিজে কাগজ, কলম ও কালি তৈয়ারি করিয়া তবে লিখিতে বসিব ? সে শক্তি, সে বুদ্ধি আমার নাই। এইগুলির জন্য আমাকে পরের উপর নির্ভর করিতে হইবেই। এই যে কাপড় জামা পরিয়া সভ্য সাজিতেছি, এইগুলিও কি পরের সাহায্য বিনা সম্ভবপর ? যে-অন্ন না হইলে আমাদের জীবন-রক্ষাই অসম্ভব, সে অন্নের জন্য আমরা পরের মুখাপেক্ষী। যে বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া আমরা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার প্রকোপ হইতে রক্ষা পাই, সে বাড়ী কি আমার একলার চেষ্টাসাধ্য ? এই যে ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিয়াছি, মিনিটে মিনিটে কত টাকা উপায় করিতেছি, ইহাও কি আমার একলাকার চেষ্টার ফল ? এই ব্যবসায়টীকে সফল করিবার জন্য অপর দশজনের সাহায্য কি আমাকে লইতে হইতেছে না ?

পরের সাহায্যভিন্ন আমাদের যে এক পাও অগ্রসর হইবার উপায় নাই, আমরা এতই পরের অধীন। সেই পরকে অমান্য করিয়া, অস্বীকার করিয়া, তাহার ন্যায্য দাবী হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আমরা নিজেদেরই দীনতা ও হীনতা প্রকাশ করি, জগতকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝাই—আমরা অজ্ঞ, নিতান্তই অজ্ঞ ; এত অজ্ঞ যে জানি না পর পর-হইয়াও পর নয়, পর নিতান্তই আপনার, পরকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারিনা, পরকে লইয়াই আমাদের ঘর, পরই আমাদের সর্ব্বস্ব।

(২)

পরের সহিত আমাদের এই যে ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়তা, ইহার প্রাণ কোথায় ? পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিতে, পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতাতে। নির্ভরশীলতা হইতেই সহানুভূতির সৃষ্টি। আবার সহানুভূতি না থাকিলে পরের উপর ঠিক্ নির্ভর করা চলে না, পরকে আপনার করিয়া লওয়া চলে না, পর পরই থাকিয়া যায়।

মানুষের মধ্যে দুইটী ভাব সবচেয়ে প্রবল—একটী সহানুভূতি আর অপরটী বিদ্বেষ। দুইটিরই কার্য্যকারিতা আছে। সহানুভূতি মিলন-সূত্র। দুইটী বিরুদ্ধধর্ম্মীকে একসূত্রে গাঁথিতে এক সহানুভূতিই সমর্থ। আবার দুইটীকে বিচ্ছিন্ন করা বিদ্বেষের কায। যাহা মন্দ, যাহা অসত্য, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাই মঙ্গল। অসতের প্রতি, মন্দের প্রতি বিদ্বেষ উচ্চ-ধর্ম্মানুমোদিত না হইলেও সাধারণ কার্য্যক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক। অসৎকে বর্জ্জন করিতে না শিখিলে সতের সহিত ঠিক্ মিল হইতে পারেনা। সতের সহিত মিলনই যথার্থ মিলন। অসতের সহিত যে-মিল, তাহা নামে মিল—কাযে নয়। সে মিল মঙ্গলের নিদান না হইয়া অমঙ্গলের নিদানই হইয়া থাকে। যে-মিলনের মূলে সহানুভূতি নাই, সে মিলন মিলনই নয়।

সহানুভূতিরই অপর নাম—সমমর্ম্মিতা। মর্ম্মে মর্ম্মে, ভাবে

ভাবে, আদর্শে আদর্শে, মিল হইলেই সমমর্ম্মিতা বা সহানুভূতির উদ্ভব হয়।

নির্ভরশীলতার গুণে একে অপরের সন্নিহিত হয়, একে অপরকে ভাল করিয়া বুঝিবার অবসর পায়। ফলে, উভয়ে যদি সৎ হয়, সরল হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি জন্মিবেই জন্মিবে, তাহারা একাত্ম হইবেই, তাহাদের মধ্যে ভেদ ভাব ঘুচিয়া যাইবেই, ঘর ও পর এক হইবেই।

পরের সহিত ভেদভাব তখনই ঘুচিয়া যায়, যখন যে যাহার নিজের কায নিষ্ঠার সহিত করে। শক্তি অবশ্য সকলের সমান নয়। তাহা না হউক, শক্তির ক্ষমতাই বড় কথা নয়—শক্তিটা নিষ্ঠার সহিত প্রয়োগ করিবার প্রবৃত্তিটাই বড় জিনিষ আর পরকে আপনার করিবার পক্ষে সেইটিই সব চেয়ে বেশী আবশ্যক।

কাহার শক্তি বেশী আর কাহার শক্তি কম তাহা নির্দ্ধারণের কোন সহজ মাপকাঠি নাই। কাহারও শক্তি একদিকে খেলে আর কাহারও শক্তি বা অপর দিকে খেলে। কেহ বিদ্যার্জ্জনে, কেহ বিদ্যাপ্রচারে, কেহ শারীরিক কার্য্যমাত্রে, কেহ ব্যবসার ক্ষেত্রে, কেহ বা অপর কোন বিষয়ে নিজের নিজের শক্তিমত্তার ভালরূপ পরিচয় দিতে পারে। ইহাদের মধ্যে শক্তি হিসাবে কে ছোট কে বড় তাহার কোন মীমাংসা আছে কি? সমাজে ব্রাহ্মণেরও যে-উপযোগিতা, মেথরেরও কি ঠিক সেই উপযোগিতা নাই? একজন বিদ্যাপ্রচার করিয়া লোকের মানসিক বা

আধ্যাত্মিক জঞ্জাল সাফ করিয়া দেন আর অপর জন ঝাড়ু লইয়া পার্থিব জঞ্জাল সাফ করিয়া দেয়। একজন সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য আর একজন সমাজের দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষা করেন। ইহাদের মধ্যে কে ছোট কে বড়? শরীর অপটু হইলে মন পঙ্গু হইয়া পড়ে; শরীর লইয়াই যাহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, সে আর অপর বিষয়ে মন দিবে কখন ও কেমন করিয়া? অপর পক্ষে, মন যাহার অপটু, অস্থির, কর্ম্মবিমুখ, ভয়প্রবণ বা জড়ভাববিশিষ্ট, তাহার শরীর সুস্থ থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি? তখনই সমাজ সুস্থ বলিয়া গণ্য হইবে, যখন সমাজস্থ ব্যক্তিপুঞ্জের শরীর ও মন একসঙ্গে সবল ও সুস্থ থাকিবে, যখন মন সহসা নিরাশ হইবে না, ভয়ে সঙ্কুচিত হইবে না, কর্ত্তব্য করিবার জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকিবে, আর শরীরও মনের নির্দেশ বহন করিবার জন্য সামর্থ্য রাখিবে।

সমাজে ছোট বড় কেহই নাই। যে যাহার নিজের ক্ষেত্রে বড়। যাহার স্বভাব—যাহার প্রবৃত্তি যে-দিকে, তাহার শক্তির গতিও সেই দিকে। অন্যদিকে সে মন দিতে গেলে সে কখনই তাহার শক্তিকে পুষ্ট ও সার্থক করিয়া তুলিতে পারে না। যাহার স্বভাব বিদ্যার্জ্জন ও বিদ্যাপ্রচারের দিকে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে সে কখনই শক্তির বিকাশ দেখাইতে পারেনা। আর যাহার স্বভাব ব্যবসায়ের দিকে, সে কখন বিদ্যাপ্রচারে শক্তির সম্যক্ পরিচয়

দিতে পারে না। হয়ত বহুসহস্রের মধ্যে এমন এক এক জন পাওয়া যায় যাঁহারা সকল দিকেই সমান যোগ্যতা দেখাইতে পারেন, কিন্তু সেরূপ লোকের সংখ্যা অল্প। তাঁহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম-স্থল। তাঁহাদিগকে লইয়া বিচার চলেনা।

কেহ বিদ্যায় বড়, কেহ কর্ম্মপটুতায় বড় আর কেহ বা শারীরিক শক্তিতে বড়, আর কেহ বা অপর কোন বিষয়ে বড়। সুতরাং ইহাদের কাহাকে ছোট আর কাহাকে বড় বলিব ?

সমাজে ছোট বড়র বিচার হয়—শক্তির পরিচয় দিবার প্রণালীতে। যে নিষ্ঠার সহিত শক্তির পরিচয় দেয়, সেই বড়। মেথর হইলেও বড়, আর ব্রাহ্মণ হইলেও বড়। আর যাহার মধ্যে নিষ্ঠা নাই, খাটিতে হয় বলিয়াই খাটে, সেই খাটুনির মধ্যে একটুও যত্নের ভাব নাই, কেবল তাচ্ছিল্য ভাব, সে ছোট ; মেথর হইলেও ছোট, ব্রাহ্মণ হইলেও ছোট।

ছোট বড়র যখন ইহাই বিচার, তখন ব্রাহ্মণ বলিয়া কাহারও পদানত হইব আর মেথর বলিয়া তাহাকে কাছ হইতে দূর করিয়া দিব, এভাব কি অপভাব নয় ? প্রকৃত বড় যে, সে ব্রাহ্মণই হউক আর মেথরই হউক তাহার কাছে মাথা নীচু করিতে সঙ্কুচিত হওয়া, তাহাকে বড়র সম্মান দিতে গিয়া পিছাইয়া আসা কখনই সুবুদ্ধির পরিচয় নহে। আর যে যথার্থ ছোট তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করিতে ছোটা নীচতারই পরিচায়ক।

(৩)

প্রাথমিক যুগে ছোট বড়র ভেদ এইরূপই ছিল। তখন কোন কার্য্য-বিশেষের সঙ্গে ছোট বড়র কোন নিত্য সম্বন্ধ ছিল না। একাযটা বড় কায আর ঐ কাযটা ছোট কায, এরূপ কোন বোধ তখন ছিল না। তখন বাঁচিতে হইবে, বাঁচিবার জন্য যে-কোন কাযের দরকার, সেই কাযই শ্রেষ্ঠ কায বলিয়া গণ্য হইত। এই জন্য ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান পাইত না। অথবা একই পরিবারের কেহ ব্রাহ্মণের কায, কেহ বা ক্ষত্রিয়ের কায আর কেহ বা বৈশ্যের কায করিত। তাহাদের মধ্যে এই বোধ ছিল যে, সহযোগিতা বিনা তাহাদের অস্তিত্ব রাখা অসম্ভব, যাহারা সহযোগী তাহারা কখন ছোট বড় হইতে পারেনা, সহযোগিতা চিরকালই সমান।

তখন হয়ত কেহ মাটি কাটিয়া খনি আবিষ্কার করিত, কেহ সে-খনি হইতে ধাতু তুলিয়া আনিত, কেহ সেই ধাতুতে অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিত, কেহ সেই অস্ত্র লইয়া পশুশীকারে বাহির হইত, দলের অপর দশজনকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিত, আর কেহ বা যন্ত্রপাতি লইয়া চাষে মন দিত; কেহ নৌকা বা গাড়ী তৈয়ারী করিত; কেহ বা চাষের ধান গাড়ীতে বা নৌকায় বোঝাই দিয়া নিজ সমাজে ও পর সমাজে বিলাইয়া আসিত। আর কেহ বা গল্প রচনা করিয়া গান গায়িয়া সকলকে আমোদ দিত, তাহাদিগকে একত্র করিয়া বাখিবার উপায় সন্ধান

করিত। অথবা তখন একজনকে হয়ত সেইরূপ একাধিক কায করিতে হইত। শেষে যত কায বাড়িতে লাগিল কাযের তত বিভাগ হইতে লাগিল। যে যাহার প্রবৃত্তি ও শক্তি মত কায বাছিয়া লইল। শেষে ছেলে বাপের কায করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় এক একটা বংশের এক একটা বিশিষ্ট কায হইয়া গেল। এইরূপেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কৃষক, সূত্রধার প্রভৃতি নানা জাতের বা শ্রেণীর সৃষ্টি ঘটিয়াছে। এই সব জাতের বা শ্রেণীর মধ্যে গোড়ায় কোন ছোট বড় ভেদভাব ছিল না। শেষে অহঙ্কারিতার বশে বা অপর কোন কারণে তাহাদের মধ্যে ছোট বড় ভাব আসে। বস্তুগত্যা কিন্তু তাহাদের কেহই ছোট নয়, কেহই বড় নয়, সকলেই সমান—সারা সমাজের পক্ষে তাহাদের সকলেরই সমান উপযোগিতা আছে। তাহারা সকলেই সহযোগী। সুতরাং তাহারা সমান নয় তো কি ?

এই জাত বড় আর ঐ জাত ছোট, এইরূপ একটা অপবোধ আমাদের সমাজে—কেবল আমাদের সমাজেই বা বলি কেন, প্রায় সকল সমাজেই—অনেক দিন হইতে রহিয়া গিয়াছে। এখন এমন একটা দিন আসিয়াছে যখন এই বোধের সংস্কার করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, যখন ছোট-বড়র সেই পুরাতন বিচার-কাঠিটা খুঁজিয়া বাহির করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সমাজের জন্য যে-কাযই করা হউক না তাহাই ভাল কায, শ্রেষ্ঠ কায। আর যে-কাযে সমাজের অহিত হয়, তাহাই ছোট

কায, নীচ কায। এই জ্ঞানটা আমাদের আবার নূতন করিয়া শিখিতে হইবে, নহিলে সমাজের রক্ষা, সমাজের উন্নতি-সাধন অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কারণ, একটা কৃত্রিম ভেদ বজায় রাখিয়া আমরা কখনই একাত্ম হইতে পারিনা। যাহা কৃত্রিম, বর্ত্তমানে যাহার কোন উপযোগিতাই নাই, সেটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া ফল কি ? পুরাতন বলিয়াই বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে ? পুরাতন ততদিনই মান্য, যতদিন তাহার উপযোগিতা আছে ; আর যখনই তাহার সে উপযোগিতা চলিয়া যায়, তখনই তাহা বর্জ্জনীয়। পুরাতনকে পুরাতন বলিয়াই মানিতে যাওয়া, বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা—অপচেষ্টা, বুদ্ধির ভ্রম।

যাহার প্রবৃত্তি বা টান যেদিকে, এখন তাহাকে সেইদিকেই যাইতে হইবে। যাহার যেমন স্বভাব, তাহাকে সেইরূপ কায করিতে হইবে। স্বভাবকে, স্বাভাবিক ঝোঁকটাকে অগ্রাহ্য করিলে আর আমাদের চলিবে না। ভট্চাজ্জি বামুনের ঘরে জন্মিয়াছি বলিয়াই যে আমাকে পূজা করিতে ছুটিতে হইবে আর মুচির ঘরে জন্মিয়াছি বলিয়াই যে জুতা শেলাই করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে ? আমার মন যদি বিদ্যাশিক্ষার দিকে, বিদ্যাপ্রচারের দিকে, এক কথায় ব্রাহ্মণের কাযের দিকে যায়, আমি কেন সে কায করিব না ? আর তোমার মন যদি জুতা সেলাইয়ের দিকে যায়, সেই দিকেই যদি তোমার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে, তাহা হইলে তুমি ব্রাহ্মণ সাজিতে চাহিলে চলিবে

কেন ? ব্রাহ্মণের কায তো তুমি ভাল করিয়া করিতে পারিবে না। যাহা ভাল করিয়া করিতে পার, তাহাই কর। তাহাই ভাল কায। কাযের মধ্যে ভেদবোধ আন কেন ? কোন কাযই তো ছোট নয়। তুমি যদি নিষ্ঠাবান্ না হও, তাহা হইলে তুমি যে কাযই কর না কেন, তুমি ছোট হইয়া যাইবেই। নিষ্ঠাই ছোট বড়র মাপকাঠি। সেটা ভুলিও না। আমি যদি মুচির ছেলে হইয়াও নিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মণের কায করিতে পারি, যোগ্যতার সহিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, আর তুমি যদি ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়াও ব্রাহ্মণের কায নিষ্ঠার সহিত যোগ্যতার সহিত করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি কখনই ব্রাহ্মণ নও, তুমি অব্রাহ্মণ, তোমার ব্রাহ্মণত্বের দাবী অন্যায় দাবী, সমাজের উপর অত্যাচার।

জাতের যদি বিচার করিতে হয়, বৃত্তি দিয়াই করিতে হইবে। বৃত্তিই জাতের মাপকাঠি। তুমি ব্রাহ্মণের বৃত্তি লইবে না, শূদ্রের বৃত্তি লইবে আর ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করিবে, শিখা তুলিয়া ঝগড়া করিবে—ইহা ঘোর অন্যায়। আর আমি তাঁতির বৃত্তি লই নাই, ব্রাহ্মণের বৃত্তি লইয়াছি, নিষ্ঠার সহিত লইয়াছি, নিষ্ঠার সহিত—যোগ্যতার সহিত সেই বৃত্তি পালন করিতেছি, তবে আমাকে কেন তুমি তাঁতি বলিয়া অগ্রাহ্য করিবে, কেন আমাকে ব্রাহ্মণের যোগ্য সম্মান দিবে না ? বংশই বড় নয়, গুণই বড়। গুণই মানুষকে বড় করে। সুতরাং

আমাতে ব্রাহ্মণের গুণ থাকায় আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ আর তোমাতে শূদ্রের গুণ থাকায় তুমি পাকা শূদ্র—তা' তুমি যাহাই বলনা কেন। জানিও বিষ্ণুভাগবতেরও মত এই যে, যাহার মধ্যে যে-গুণ দেখিবে তাহাকে সেই গুণ দিয়া বিচার করিবে, সেই গুণ দেখিয়াই স্থির করিবে, সে ব্রাহ্মণ না শূদ্র। মহাভারতকারেরও ঠিক সেই মত। তিনিও বলেন, যাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণ দেখিবে, তিনি শূদ্রের ছেলে হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান পাইবেন আর যাহাতে শূদ্রের গুণ দেখিবে সে ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেও তাহাকে শূদ্র বলিয়া মনে করিবে।

(৪)

যখন জাত হিসাবেও কেহ ছোট নয়, কেহ বড় নয়—যে নিজেকে বড় বলে সে জোর করিয়াই বলে, তখন জাতের দোহাই দিয়া নিজেদের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী ভেদের বেড়া জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা কখনই বুদ্ধিমানের কায নয়। জাতটাকে একটা কঠিন নিগড়ে বাঁধিয়া রাখিয়া কোন লাভ নাই। জাতীয় জীবনটা —সমাজ-জীবনটা—নদীর স্রোতের মত। স্রোত যদি বন্ধ কর, নদী পঙ্কিল হইয়া পড়ে; তাহাতে নানারোগের বীজ উৎপন্ন হয়; যাহা এককালে স্বাস্থ্য বিধায়ক ছিল, তাহাই কালে স্বাস্থ্য হানি-কর হইয়া উঠে। ঐরূপ, জাতীয় জীবনের স্রোত যদি বন্ধ করিয়া ফেল, যদি স্বাভাবিক নিয়মে উঠা-নামার পথ রোধ করিয়া বস,

যদি গুণের উপর—বৃত্তির উপর—আচরণের উপর জোর না দাও, যদি কেবল বংশের উপরই জোর দিতে থাক, তাহা হইলে সমাজের সকল অঙ্গই দুর্ব্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়িতে বাধ্য। যাহার যে-কায তাহাকে দিয়া সেই কায করাইলে কাযও ঠিক হয়, সেও ঠিক থাকে ; কিন্তু যাহার যে কায নয়, তাহাকে দিয়া সেই কায করাইতে চাহিলে কাযও ঠিক হয় না, সেও বিকল হইয়া যায়।

আমরা যদি কেবল মনে রাখি যে, দেহের পক্ষে মাথারও যে আবশ্যকতা, হাতপারও সেই আবশ্যকতা, হস্তপদহীন দেহ থাকাও যা' না থাকাও তা', ঐরূপ মস্তকবিহীন দেহ তো শব মাত্র, তাহা হইলে অনেক গোল আপনিই কাটিয়া যায়। কারণ সমাজ-সম্বন্ধেও ঠিক ঐকথা। সমাজে ব্রাহ্মণও চাই, মেথর ও চাই। কেবল ব্রাহ্মণ থাকিলে বা কেবল মেথর থাকিলে চলিবে না। যখন উভয়েরই যোগ্যতা রহিয়াছে আর যখন একের কার্য্যকারিতা অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে, যখন উভয়ের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তখন মেথরকে মেথর বলিয়া দূরে রাখিতে যাওয়া সুস্থবুদ্ধির পরিচয় কি ?

যখন পরকে আমি ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, তাহাকে বুদ্ধির দোষে যতই ঘৃণা করি না, দূরে সরাইয়া রাখি না, সে আমার নিতান্তই আপনার, তখন পরকে আদর করিয়া, তাহাকে নিজের মত করিয়া দেখাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এই পরকে নিজের

মত করিয়া দেখা এক মানুষ ভিন্ন অপর কোন জানোয়ারে সাধারণতঃ সম্ভবপর নয় বলিয়াই উহা মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্বের বিকাশেই আমাদর জীবনের সার্থকতা। গীতায় যে সম-দৃষ্টির কথা আছে, তাহা এই জিনিষই। গীতার মতে সম-দৃষ্টিই মুক্তি। অর্থাৎ মানুষ তখনই মুক্ত, তখনই তাহার সকল আকঙ্ক্ষার— সকল দ্বেষের শেষ, যখনই সে সকলকে নিজের মত করিয়া, নিজেরই বিভিন্ন বিকাশ মনে করিয়া চলিতে ফিরিতে পারিবে, যখনই সে নিজের মধ্যে ও পরের মধ্যে কোন ভেদ—কোন পার্থক্য দেখিতে পাইবে না।

এই মনুষ্যত্ব বিকাশ করিতে হইলে নিজের কাযকর্ম্মের উপর, নিজের চরিত্রের উপর—স্বভাবের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হয় অর্থাৎ এক কথায় আত্মসংযম শিখিতে হয়। যা-তা কায করিলে বা যা-খুসি-তা করিয়া বসিলে অথবা যাহা মনে আসিল তাহাই বিচার না করিয়া বলিয়া ফেলিলে কেহ নিজের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে না; সে তাহার খেয়ালের, ইন্দ্রিয় গুলির, রিপুগুলির দাস হইয়া উঠে। যে রিপুর দাস, খেয়ালের বশ, সে নিজের শত্রু। যে নিজের শত্রু, সে পরেরও শত্রু। ঘর-পর কিছুর উপরই সে নিশ্চিন্তভাবে নির্ভর করিতে পারে না। যে পরকে তাহার যোগ্যসম্মান দিতে পারে না, সে আবার পরকে আপন করিবে কোন্ শক্তির বলে?

(৫)

যাহার যাহা শক্তি, জীবন যাত্রায় তাহাই তাহার মূলধন। কাহারও মূলধন বিদ্যা, কাহারও শারীরশক্তি, কাহারও বা অপর কিছু। এই মূলধনকে অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে জীবন পথে অগ্রসর হইতে হয়। এই মূলধন হারাইলে, উহার অযথা-ব্যয় করিলে বা উহার প্রয়োগে কুণ্ঠিত হইলে আমরা নিজেরও যেমন অহিত করি পরেরও তেমনি অহিত করি। কারণ, নিজের অহিতের সঙ্গে পরের অহিত এবং পরের অহিতের সঙ্গে নিজের অহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ-যুক্ত। শক্তির যথা-প্রয়োগ করিতে শিখাই আত্মসংযম। আত্মসংযমই উন্নতির মূল।

উন্নতি বলিতে কেবল লৌকিক উন্নতি, পয়সাকড়ির উন্নতি বুঝিলে চলিবে না, চরিত্রের উন্নতিও বুঝিতে হইবে। চরিত্রের উন্নতিই যথার্থ উন্নতি। পয়সাকড়ির উন্নতি যথার্থ উন্নতি নয়। পয়সাকড়ির নিজের তো কোন মূল্য নাই। সেগুলি অভাব পূরণের সহায়ক সহজপন্থা বলিয়াই লোকে উহাদের আদর করিয়া থাকে। কিন্তু চরিত্রের নিজের একটা মূল্য আছে আর সে মূল্য পয়সাকড়ি দিয়া তৌল করা যায় না, সে মূল্যই মনুষ্যত্ব। অথবা চরিত্রবত্তা ও মনুষ্যত্ব এই দুইয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। চরিত্রবান্ না হইলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না আর প্রকৃত মানুষ না হইলে—পরকে

আপনার বলিয়া ভাবিতে না শিখিলে চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ কখন হয় না।

মানুষ হইতে চাহিলে, প্রকৃত উন্নতি খুঁজিলে, মানুষকে নিজের উপর বিশ্বাস রাখিতে হয়। নিজের উপর বিশ্বাস রাখিতে না পারিলে উন্নতির পথে এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না। 'যা করেন ভগবান' 'আমি দৈবের দাস'—এই সব ভাব অন্ধ তামসিক ব্যক্তির ভাব। আমি যখন মানুষ, ভগবান যখন আমাকে ভাবিবার জন্য মন, কাযকর্ম্ম করিবার জন্য হাত পা প্রভৃতি দিয়াছেন, আমাকে একটা স্বতন্ত্র জীবরূপে সৃষ্টি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন—তখন কথায় কথায় দৈবের আশ্রয় লইলে চলিবে কেন? আমাকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে। সবই দৈবাধীন না বুঝিয়া এরূপ কেন বুঝি না যে, আমি যাহা করি না কেন, তাহা আমারই কায আর যখন আমার মধ্যে ভগবানের অধিষ্ঠান আছে, তিনিই যখন সকল কাযের—সকল ভাবের উৎসস্বরূপ, তখন তিনিই আমার সকল কাযের সকল ভাবের নিয়ামক; আমার-করা কায প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই-করা। এরূপ ভাবিবার সাহস যদি না থাকে তাহা হইলে নিজের ব্যক্তিত্বই বা ফুটিবে কি করিয়া আর পরের হিতে আত্ম সমর্পণ করিয়া জয়তিলক পাইবই বা কি করিয়া? মুক্তিই জয়তিলক। যাহার সাহস নাই, তাহার কিছুই নাই। যাহার মনে দৃঢ়তা নাই, স্থিরতা নাই, তাহারও কিছুই নাই। আত্মবোধ—নিজের মধ্যে ঈশ্বরের বিকাশ—পরের মধ্যে নিজের

ছায়া দর্শন-শক্তি—যার-তার জন্মে না; সে বোধ জন্মে কেবল তাহারই, যে বলহীন নয়, যে অস্থির-চিত্ত নয়, যে শ্রমকুণ্ঠ নয়, দৈবের বশ নয়, অলস নয়, নিজের মূলধনের যথা-নিয়োগে কুণ্ঠিত নয়, এক কথায় যে আত্মসংযত। সাহস আত্মসংযমের প্রাণ।

আত্মসংযমের জন্য তপস্যা করিতে হয়। তপস্যা মানে বনে গিয়া জপতপ নয়। তপস্যা তিন রকম যথা—শারীর, বাঙ্‌ময় ও মানস। যাঁহারা গুরুজন, যাঁহারা শ্রেষ্ঠব্যক্তি, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করা ও তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান, সরল ব্যবহার, যাহাতে ইচ্ছা করিয়া কাহারও ক্ষতি না করি এজন্য নিজেকে সাবধানে রাখা, অসৎসঙ্গের দ্বারা শরীরটাকে কলঙ্কিত না করা আর অযথা বীর্য্য নষ্ট না করা—ইহাই শারীর তপ। যাহাতে কাহারও মনে উদ্বেগ জন্মিতে পারে এমন কথা না বলা অথচ সত্য কথা বলা, প্রিয় কথা বলা, হিতকর কথা বলা, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা—এই সব বাঙ্ময় তপস্যা। মনকে অবসন্ন হইতে না দেওয়া, মনটা সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখা, নিজের শান্তভাবটা সর্ব্বদা বজায় রাখা, উপর-পড়া হইয়া কাহারও কথার মধ্যে কথা না কহা, ঠিক সময়ে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করা, নহিলে চুপ করিয়া পরের কথা শুনা, শান্তভাবে পরের যুক্তি শুনা ও অপ-যুক্তি খণ্ডন করা, পরের কোন কথায় বা কাযে হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া না উঠা, ভাবিয়াচিন্তিয়া কাযকর্ম্ম করা, হঠাৎ কিছু করিয়া না বসা—এইগুলি মানস তপস্যা।

কাজেই তপস্যার নামে ভয় পাইবার কিছু নাই। এরূপ তপস্যা তো যে-সে সকলেই করিতে পারে এবং সকলেরই করা উচিত। আমরা সংসারে থাকিয়া সকল সময়েই তপস্যা করিতে পারি। তপস্যার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময় বা স্থান আবশ্যক হয় না। সৎকার্য্য মাত্রই তপস্যা, সৎভাব পোষণ মাত্রই তপস্যা, সদাচরণ মাত্রই তপস্যা, সৎবাক্যকথন মাত্রই তপস্যা। তপস্যা কিছু উদ্ভট জিনিষ নয়।

(৬)

তপস্যা করিতে থাকিলে সহজেই আত্মপরভেদ-বুদ্ধি লোপ পায়, উন্নতির পথ সহজ হইয়া আসে, পরের হিতের জন্য সময় কাটাইতে, শক্তি ব্যয় করিতে মনে কোন দ্বিধা আসে না, কেবল নিজেকে সর্ব্বস্ব ভাবিতে প্রবৃত্তি জন্মে না, বিপদ দেখিয়া, কষ্ট দেখিয়া পিছাইতে ইচ্ছা হয় না, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় দৃঢ়ভাবে তাহাই করিবার জন্য মনের মধ্যে বেশ জোর পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সুখ দুঃখকেই বড় করিয়া দেখিতে থাকিলে তপো. ভঙ্গ হয়, চরিত্রের অবনতি ঘটে। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চলিতে পারাই পুরুষত্ব, তাহাই তপস্যা।

তাপস হইলে আর নিজের শক্তির অযথা সঞ্চয়ে বা অযথা ক্ষয়ে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না; তখন এই বোধ বেশ

স্পষ্টভাবেই জন্মে যে, যে অর্থবান্ হইয়াও নিজের ও পরের জন্য অর্থের সদ্ব্যয় করে না, যে বিদ্বান্ হইয়াও নিজের ও পরের জন্য বিদ্যার সদ্ব্যয় করে না, যে বলবান্ হইয়াও নিজের ও পরের কাযে নিজের শারীর শক্তিকে নিয়োগ করে না, যে আধ্যাত্মিক বলে উন্নত হইয়াও নিজের ও পরের হিত সাধিয়া নিজেকে পরহিতব্রত করিয়া তুলিতে পারে না, সে কৃপণ, কৃপারই পাত্র। তাহার সে অর্থ, তাহার সে বিদ্যা, তাহার সে শারীরশক্তি বা আধ্যাত্মিক বল থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি ? যাহা কাযে আসিল না, সে ধন থাকা-না-থাকা দুইই সমান। কাযে আসিলেই ধনের সার্থকতা। নহিলে ধনের কোন মূল্য নাই। গৃহত্যাগী কর্ত্তব্যচ্যুত বনবাসীকে বরং ক্ষমা করা যায়, কিন্তু এরূপ ব্যক্তিকে সমাজ কখন ক্ষমা করে না। কারণ ইহারা সমাজের বুকের উপর বসিয়াই অকর্ম্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সমাজের অহিত করিতে থাকে। ইহারা সমাজ-শত্রু। কেবল সমাজেরই বা বলি কেন, নিজেরও শত্রু।

(৭)

তাপস না হইলে, আত্মসংযম না শিখিলে, মানুষের সকল প্রকার উন্নতির পথই রুদ্ধ হইয়া যায়। তপোভীরু যে, সে কি মানুষ ? তাহাতে আর অপর জানোয়ারে পার্থক্য কি ? যে তপোভীরু সেই অক্ষম, সেই দুর্ভাগ্য। তাহার সেই অক্ষমতা,

তাহার সেই দুর্ভাগ্য তাহারই নিজের অপকর্ম্মের ফল—তাহারই নিজের হাতে তৈয়ারি-করা বিষ। সে নিজের শক্তির পরিচয় জানে না, অথবা জানিয়াও অলস। আলস্য সকল শক্তির, সকল তেজের ধ্বংসসাধক।

যাহাতে এই মহাসর্ব্বনাশকর আলস্য কাহারও না জন্মে, এজন্য নিজের ও পরের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হয়, সর্ব্বদা কার্য্যব্যস্ত পরহিত-পরায়ণ ব্যক্তিদের কাহিনী শুনিতে ও তাঁহাদের কায দেখিতে হয়। এরূপ দেখিয়া ও শুনিয়া নিজেকে ও পরকে সাবধান করিয়া রাখিতে হয়। এরূপ চেষ্টাই তপস্যার নামান্তর।

শিশু যাহাতে জীবনের প্রথম হইতেই আলস্যের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে, এজন্য পিতামাতাকে সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে হয়। পিতামাতার জীবন সামনে রাখিয়াই শিশু তাহার জীবন গড়িয়া তোলে। কাযেই পিতামাতার দায়িত্ব কম নয়। তাঁহাদের কাযকর্ম্মের উপরেই, তাঁহাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর উপরেই ভবিষ্যৎ সমাজের হিত বা অহিত সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

পিতামাতার মত শিশুর গুরুজন, নিকটআত্মীয় ও প্রতি-বেশীদেরও দায়িত্ব কম নয়। তাঁহারা সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে শিশুর জীবনে ছায়াপাত করিয়া থাকেন। শিশু প্রথম

হইতে যেরূপ সঙ্গ পাইবে, সেইরূপ ভাবেই গড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

মানুষ পাপী হইয়াও জন্মে না, পুণ্যবান্ হইয়াও জন্মে না। সাধারণতঃ তাহার শৈশব শিক্ষার উপরেই পরবর্ত্তীকালে তাহার পাপী হওয়া বা পুণ্যবান্ হওয়া নির্ভর করে। অবশ্য স্বভাব বলিয়া একটা কিছু আছে, যাহা শিক্ষা ও সঙ্গ দ্বারা বিনষ্ট হয় না, যাহা মানুষের নিতান্তই আপনার। কিন্তু সে স্বভাবও শিক্ষা ও সঙ্গের গুণে একেবারে বদলাইয়া না যাউক অনেকটা নিয়মিত হয়। স্বভাবকে নিয়মিত রাখিবার শক্তি মানুষ ধরে বলিয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব।

স্বভাব বলিতে আমি মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি বুঝিতেছি। যেমন, কাহারও স্বভাব শান্তিপ্রবণ, কাহারও চঞ্চল, কাহারও জড়তাপূর্ণ; কাহারও স্বভাব কোমল, কাহারও রুদ্র, কাহারও তেজঃপূর্ণ; কাহারও স্বভাব দয়ালু, কাহারও হিংসাপ্রবণ। মানুষের এইরূপ যে স্বভাব তাহা তাহার একান্তই নিজস্ব জিনিষ। এই স্বভাবকে আমরা কেহই অগ্রাহ্য করিতে পারি না। এই স্বভাবের পার্থক্য হইতেই মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে; সকলে যে ঠিক্ একরকম হয় না, শিক্ষা ও সঙ্গ সমরূপ হইলেও একছাঁচে গড়িয়া উঠে না, তাহার কারণই হইতেছে স্বভাবের পার্থক্য।

স্বভাবের সহিত পাপ-পুণ্যের কোন নিত্যসম্পর্ক নাই।

পাপ-পুণ্য আপেক্ষিক শব্দ, সমাজের আত্মরক্ষার জন্য একটা তৈয়ারি-করা ভাব। এই অবস্থায় এই কাযকে পাপ বলিব আর অপর-এক অবস্থায় এই কাযকেই আবার পুণ্য বলিব। অবস্থা-নিরপেক্ষ পাপও নাই, পুণ্যও নাই। রাগের বশে, কি হিংসা করিয়া কাহাকেও হত্যা করা পাপ ; কিন্তু বিচারাসনে বসিয়া সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া কাহারও প্রাণদণ্ড দেওয়া পাপ নয়—পুণ্য ; ঐরূপ, দেশ-শত্রুর প্রাণদণ্ডও পাপ বলিয়া কোথাও নিন্দিত হয় নাই। তাহাই পাপ, যাহার মূলে বিদ্বেষ, হিংসা, রাগ বা ঐরূপ কোন নীচভাব লুকান আছে ; আবার তাহাই পুণ্য, যাহার মূলে একটা সদ্ভাব বিরাজ করিতেছে।

পাপ-পুণ্যের যখন এই সংজ্ঞা, তখন আর মানুষ জন্মমাত্র পাপী বা পুণ্যবান্ হইবে কেমন করিয়া ? শিশু পাপীও নয়, পুণ্যবান্‌ও নয়। পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে সে উদাসীন। সে যে পরে পাপী বা পুণ্যবান্ হয়, তাহা তাহার শৈশব ও যৌবনকালীন শিক্ষার ও সঙ্গের ফল।

এই শিক্ষা ও সঙ্গ যাহাতে প্রথম হইতে সমাজের হিতসাধক হয়, যাহাতে একটা সদ্ভাবের মধ্য দিয়া শিশু গড়িয়া উঠে, সেজন্য দায়িত্ব পিতামাতার যেমন, আত্মীয় গুরুজন ও প্রতিবেশীদেরও সেইরূপ। কাহারও দায়িত্ব কম নয়। এইজন্য কেবল নিজের ঘরটার সংস্কার করিলে চলে না, পরের ঘরের দিকেও তাকাইতে হয় ; নিজের মঙ্গলের জন্যই, নিজের সন্তানের

মঙ্গলের জন্যই তাকাইতে হয়। পরকে উপেক্ষা করিয়া, পরের হিত না খুঁজিয়া আমরা নিজের হিত সাধিতে পারি না, তা' সে যত চেষ্টাই করিনা কেন। পরকে লইয়াই আমাদের ঘর। পরের হিতের সহিত আমাদের হিত—আমাদের ঘরের হিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এই দুইটাকে পৃথক করিয়া দেখিবার কোন যো নাই। এমন কোন শক্তি নাই, এমন কোন বিদ্যা নাই, যাহার বলে এই দুইয়ের মধ্যে সত্যকার বিচ্ছেদ ঘটান যাইতে পারে।

(৮)

সকল দোষের আকর—আলস্য আর উপেক্ষা-পরায়ণতা। শিশু যদি জীবনের প্রথম হইতেই এই দুইটী শত্রুর হাত এড়াইতে শিখে, তাহা হইলে তাহার জীবন কখনই ব্যর্থ যাইতে পারে না। কিন্তু পিতামাতা প্রভৃতি যদি এ বিষয়ে নিজ জীবনেই সাবধান না হন, যদি তাঁহারা নিজেরা অলসপ্রকৃতি ও উপেক্ষাপরায়ণ হন, তাহা হইলে শিশু কেমন করিয়া এই দুই শত্রুকে জয় করিবার শক্তি লাভ করিবে? শিশু তো যেমন দেখিবে তেমনই শিখিবে। কানের অপেক্ষা চোখকেই সে বেশী বিশ্বাস করে।

সুতরাং কুসঙ্গ ও কুশিক্ষা হইতে শিশুকে রক্ষা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। সহজ ব্যাপার নয় বলিয়াই দেশে খাঁটি

মানুষের সংখ্যা বড় বেশী নাই। সাধারণ লোককে তো সারাজীবন সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হয়; ফলে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা যে একই জিনিষের দুইটী দিক্‌মাত্র তাহা তাহারা জানিবার বড় একটা অবসর ও সুযোগ পায় না। কাজেই তাহাদের ঘরেও সুখ নাই, বাহিরেও সুখ নাই। ঘর-পরকে পৃথক দেখিতে শিখিলেই জীবন মরুময় হইতে বাধ্য। ঘর-পর এক করিতে শিখিলেই জীবনে তৃপ্তি সান্ত্বনা ও সুখ মিলে, নহিলে নয়।

আমরা শিশুকাল হইতে ঘর-পরকে এক ভাবিতে শিখি না, কেহ আমাদিগকে সে শিক্ষা দেয় না। ঘর-পর যে এক সে ধারণা এখন সকলে এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছি বলিলেই হয়।

শিক্ষা বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি, তাহা প্রকৃত শিক্ষা নয়। কেবল অর্থকরী বিদ্যালাভকেই শিক্ষা বলে না। শিক্ষা তখনই সার্থক, যখন শিক্ষার গুণে ঘর-পর এক হইয়া যায়, আত্মপর-ভেদবোধ লোপ পায়, যোগ্যব্যক্তিকে সম্মান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, যাহা পাপ তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা সর্ব্বদাই মনে জাগিয়া থাকে।

সেই সঙ্গই যথার্থ সঙ্গ, যে সঙ্গের ফলে মনে প্রসারতা জন্মে, সকল সঙ্কীর্ণতা কাটিয়া যায়, ছোট বড় সম্বন্ধে যে কৃত্রিম ভেদ সমাজে আজকাল দেখা যায় তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য মনের মধ্যে অদম্য উত্তেজনা জন্মে।

সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গকেই আমরা অনেকেই সৎসঙ্গ বলিয়া মনে করি। কিন্তু সেরূপ মনে করা ভুল। সংসার ত্যাগ করিলেই, সংসারের কর্ত্তব্য হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেই কেহ সৎ হয় না। সে-ই সৎ যে তাহার জীবন ঘরের ও পরের হিতে সমর্পণ করিয়াছে। যে কেবল নিজের হিত খুঁজে, নিজের পারলৌকিক মুক্তি চায়, সে তো তপোভীরু ব্রতচ্যুত কাপুরুষ। সংসারের জ্বালা ও কষ্ট হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিয়া সংসারের সুখটুকু ভোগ করাই তাহার উদ্দেশ্য।

ঐরূপ ভাক্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গ সৎসঙ্গ নয়। একজন চণ্ডালকেও আমি সাধু বলিয়া প্রণাম করিতে রাজী আছি, যদি দেখি সে তাহার কায নিষ্ঠার সহিত করিয়া যাইতেছে, তাহার ভিতরে অসারল্য নাই, ঘর-পর যে ভেদ এই অপবোধ তাহার নাই।

(৯)

বাস্তবজীবনে আমরা প্রকৃত সাধু ব্যক্তির সঙ্গ খুব কমই লাভ করি। সে সৌভাগ্য অতি অল্পলোকেরই ঘটে। তবে অন্য এক উপায়ে আমরা সে অভাব কতকটা দূর করিতে পারি। তাহা গ্রন্থপাঠ দ্বারা। গ্রন্থপাঠ করিয়া প্রকৃত সাধুব্যক্তিদের জীবনকাহিনী জানিতে পারি, একটা আদর্শচিত্র মনের মধ্যে আঁকিয়া লইতে পারি আর সেই আদর্শকে নিজের জীবনে সার্থক করিবার জন্য চেষ্টাও পাইতে পারি। গ্রন্থপাঠ করিয়াই আমরা

জানিতে পারি, কোন্ গুণে একটা জাতি যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব পায়, আর কোন্ দোষে সেই জাতির অধঃপতন ঘটে ; আর তাহা জানিতে পারিয়া নিজেকে ও অপরকে সাবধান করিয়া দিতে পারি এবং নিজ সমাজকে পতনের পথ হইতেও রক্ষা করিতে পারি।

সুতরাং শিশুকে গ্রন্থপাঠ করিতে শিখান যে কতদূর আবশ্যক,তাহা না বলিলেও চলে। কাহারও কাহারও ধারণা—বেশী লেখাপড়া শিখিলে মানুষ অপরকে অশ্রদ্ধা করিতে শিখে, আত্মীয়-স্বজনের মর্য্যাদা রাখে না, সর্ব্ব বিষয়েই নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিতে চায়, সুতরাং সন্তানকে বেশী লেখাপড়া শেখান অন্যায়।

এইরূপ ধারণা যে ঠিক নয়, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। শিক্ষাদিবার দোষে ও সঙ্গের দোষে যে ঐরূপ অপশিক্ষা কাহারও কাহারও না জন্মে তাহা নয়। তবে তাহা তো গ্রন্থপাঠের দোষ নয়। দোষ শিক্ষাদান-প্রণালীর ও সঙ্গের। অত্যধিক আদর দিয়া বা অত্যধিক শাস্তি দিয়া যদি কেহ শিশুকে মানুষ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার শিশু, কালে বহুগ্রন্থের পাঠক হইলেও, ঠিক্ মানুষটী হইয়া উঠিতে পারে না। কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আদরও চাই, কঠোরতাও চাই, এই

উভয়েরই মধ্যে সহৃদয়তার যোগ না রাখিতে পারিলে কেহই সুশিক্ষকের মর্য্যাদা পাইতে পারেন না।

তাছাড়া, যেমনটী করিয়া শিখাইলে শিক্ষা সার্থক হয়, তেমনি করিয়া শিখাইতে আমরা কয়জন জানি? শিশুকে পড়াইতে গিয়া আমরা অনেকেই ধৈর্য্যচ্যুত হই। শিশু শিখিতে পারিতেছে না, ইহা তাহার দোষ নয়, দোষ আমার শিক্ষাদান প্রণালীর। শিশু যাহাতে বিষয়টী সহজে ধারণা করিতে পারে, তাহা আগে স্থির করিয়া লইবার দিকে আমাদের কাহারও লক্ষ্য নাই। কাজেই শিশু কিছু শিখে না, বই-ই মুখস্থ করে।

কেবল বই মুখস্থ করিলেই শিখা হয় না। বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিতে শিখিলেই, বিচার করিতে শিখিলেই যথার্থ শিক্ষা হয়। শিশুদিগকে আমরা সেরূপভাবে শিক্ষা দিই কি?

কেবল কতকগুলি বই পড়িয়া আর সেই সব বইএর ভাবার্থ না বুঝিয়া কেহ যদি পণ্ডিত সাজিতে চায় আর সকলের নিকট নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে কি তাহা বহুগ্রন্থ পাঠের দোষ?

আমি গ্রন্থ মুখস্থ করার কথা বলিতেছি না, গ্রন্থ পড়িতে শিখানোর কথা বলিতেছি; গ্রন্থ পাঠের সঙ্গে শিশুকে চিন্তা করিতে, বিচার করিতে শিখাইবার কথা বলিতেছি। সেরূপ ভাবে যদি শিশুকে গ্রন্থ পড়ান হয়, তাহা হইলে গ্রন্থপাঠ কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না, গ্রন্থপাঠে উপকার হইবেই হইবে।

শিশুমাত্রকেই গ্রন্থপাঠ করিতে শিখানো আবশ্যক। গ্রন্থপাঠ করিতে না শিখিলে জীবনে একটা মস্ত অভাব থাকিয়া যায়। শিশুকে গ্রন্থপাঠ হইতে বঞ্চিত রাখিয়া পিতামাতারা, আত্মীয়-স্বজনেরা, প্রতিবেশীরা শিশুর মহা অহিত সাধিয়া থাকেন, শিশুর উন্নতির পথে কাঁটা দিয়া থাকেন।

আমাদের এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখা চাই—অর্থ উপায় করাই গ্রন্থপাঠের মুল উদ্দেশ্য নয়, মানুষ হইয়া উঠাই গ্রন্থপাঠের মূল উদ্দেশ্য। গ্রন্থপাঠ দ্বারা শিশু সৎসঙ্গের অভাব অনেকটা দূর করিতে পারে। সদ্‌গ্রন্থের মত সুবন্ধু আর নাই। সেই সুবন্ধু হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা উচিত কি? তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিলে তাহার অপশিক্ষার জন্য আমাকেও যে ভুগিতে হয়।

(১০)

শিশু বলিতে আমি ছেলে মেয়ে উভয়কেই বুঝিয়াছি। ছেলেদের শিক্ষার দিকে ঝোঁক দিতে বড় বেশী লোকের আপত্তি দেখা যায় না; কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার কথা উঠিলে এখনও অনেকের নাসিকা কুঁচকাইয়া যায়। মেয়েরা যে ছেলেদেরই মত সমাজদেহের একটা অচ্ছেদ্য অঙ্গ তাহা তাঁহারা একবার মনেও ভাবেন না।

মেয়েদের শিক্ষা দিবার খুব আবশ্যকতা আছে। সংসার

মাত্রেই তো দেখা যায় যে, যে-মেয়ে যত বুদ্ধিমতী, সে যত গুছাইয়া সংসার চালায়, অপর কেহ তত পারে না। মেয়েরাই সংসারের কর্ত্রী। যাহারা সংসারের হাল ধরিয়া আছে, শিশুদের প্রথম শিক্ষার ভার যাহাদের হাতে, সংসারটাকে স্বর্গ বা নরকে পরিণত করা যাহাদের আয়ত্তের ভিতর, তাহারা যদি শিক্ষিত হয়, তাহাদের মধ্যে যদি কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা স্থান না পায়, ঘর-পর যে আলাদা নয়, এ জ্ঞান যদি তাহাদের জন্মে, তাহা হইলে ঘর কতই না সুখের স্থান হইয়া উঠে।

শোকের সময় মেয়েরাই আমাদের সান্ত্বনার স্থল, দুঃখের সময় তাহারাই পাশে আসিয়া সে-দুঃখের ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লয়, সুখের সময়ও তাহারা আমাদের সঙ্গিনী, অবসাদের সময়ও তাহারা আমাদের উৎসাহদাত্রী। তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে যাওয়ার মত ভুল আর নাই। মেয়েরা আমাদের উপেক্ষার পাত্রী নয়।

তাছাড়া, আমাদের এই জাতীয় অধঃপতনের দিনে মেয়েদের একদিকে ঠেলিয়া রাখা কোন মতেই চলিতে পারে না। সমাজ-দেহের স্ত্রী-পুরুষ এই দুইটী অঙ্গই সমান সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে হইবে, নহিলে জীবন-সংগ্রামে আমাদের পরাজয় অনিবার্য্য। জীবন-সংগ্রামে পরাজয় মানেই জগৎ হইতে অস্তিত্ব লোপ আর নয় কোল-সাঁওতালের মত বর্ব্বর জাতিতে পরিণতি। এইরূপ পরিণাম কি কল্পনার বিষয়?

এইরূপ পরিণাম যদি আমাদের আকাঙ্ক্ষনীয় না হয়, তাহা হইলে ছেলেদের মত মেয়েদেরও শিক্ষা দিবার জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবে। কিন্তু কিরূপ শিক্ষা তাহাদিগকে দিব ?

তাহাদিগকে আমরা এমন শিক্ষা দিব যাহা তাহাদের প্রকৃতির অনুযায়ী, যাহা তাহাদের জীবনযাত্রায় সাহায্য করিতে পারে, যাহা তাহাদের মধ্যে স্ত্রীত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরপ্রিয়তা জাগাইয়া তুলে, যাহাতে তাহাদের কোণে-বউএর ভাব দূর হইয়া গিয়া তাহাদের মধ্যে তেজস্বিনী সুভদ্রা বা সাবিত্রী সুলভ ব্রীড়ার ভাব, সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা ফুটিয়া উঠে ; এক কথায়, যাহাতে তাহারা সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইয়া উঠিতে পারে।

এখন শিক্ষার অভাবে মেয়েরা আর যাহাই হউক প্রকৃত সহধর্ম্মিণীত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এখনও অনেক গুণ আছে ; কিন্তু তবুও তাহারা এখন পুরুষের সকল কাযে সহযোগিনী ও সহধর্ম্মিণী নয়। তাহাদের আর্য্যআদর্শ অতি মহৎ। সহধর্ম্মিণীত্বলাভই তাহাদের আর্য্য-আদর্শ। শিক্ষার অভাবে তাহারা সে-আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সহধর্ম্মিণী বলিতে ঠিক কি বুঝায়, তাহাও তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা সহচারিণী বটে, কিন্তু সহধর্ম্মিণী নয়।

শিক্ষা দিবার নাম করিয়া আমরা এখন মেয়েদের যাহা শিখাই, তাহা কিছুই নয় ; তাহাতে কোন শিক্ষাই হয় না।

বোধোদয় পড়াইলেই বা কি আর না পড়াইলেই বা কি। তাহাতে বড় জোর নভেল পড়িবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়, এই মাত্র। কিন্তু নির্ব্বিচারে যা-তা নভেল পড়িতে দেওয়া কি ভাল?

মেয়েদের পাঠ্য পুস্তক মেয়েদের উপযোগী করিয়াই লিখিতে হইবে। আর তাহাই তাহাদিগকে পড়াইতে হইবে। তাহাদের পাঠারম্ভ হইবে—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সুভদ্রা প্রভৃতি আর্য্য নারীদের কাহিনী লইয়া। এই সব কাহিনী অতি সরল ভাষায় বিবৃত করিয়া তাহাদিগকে পড়িতে দিতে হইবে। আর্য্যসভ্যতার ধারা বজায় রাখিয়া তাহাদের উপযোগী ভাবে নূতন নূতন গল্প রচিতে হইবে। সেগুলিও তাহারা পড়িবে। আর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিতে, তুলনা করিতে, বিচার করিতে শিখিবে। তারপর ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধের মত বই, কালীপ্রসন্ন বাবুর 'আর্য্যনারীর' মত বই তাহাদিগকে পড়াইতে হইবে। শেষে সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সহজ সূত্রগুলিও তাহাদিগকে জানাইতে হইবে। তাহারা সেসব, মেয়েদের আদর্শের দিক্ হইতেই, দেখিবে। সমাজ-জীবনের সহিত মেয়েদের যোগ কোথায় ও কিরূপ তাহা তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাবেই বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহারাও ইতিহাস পড়িবে, তবে ঝগড়া-ঝাঁটি বা যুদ্ধবিগ্রহের দিক্ হইতে নয়, সমাজ-জীবনের দিক্ হইতে। ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিবরণে তাহাদের কোন কায নাই; কোন্ সালে আলেকজাণ্ডার

ভারতে আসিলেন আর কটা যুদ্ধে জিতিলেন, তাহা তাহাদিগকে জানাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। আলেকজাণ্ডার কেন আসিলেন, কেন যুদ্ধ জিতিতে পারিয়াছিলেন, জাতির অধঃপতনের মাত্রা তখন কতদূর পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেই সব জানিলেই কায হইবে। মামুদ কয়বার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে-সূক্ষ্মবিচার তাহারা নাই বা করিল। তবে মামুদের সহিত যুদ্ধে মেয়েরা যে নিজেদের বেণী কাটিয়া ধনুকের ছিলা করিয়া দিয়াছিল, গায়ের অলঙ্কার খুলিয়া দিয়া যুদ্ধের খরচা যোগাইয়া ছিল, সেসব কথা তাহাদিগকে জানাইতে হইবে। রাজপুত-ইতিহাসে, শিখ-ইতিহাসে, মারাঠা-ইতিহাসে মেয়েদের কৃতিত্ব কতখানি তাহাও তাহাদিগকে বেশ করিয়া বুঝাইতে হইবে।

কেবল তাহাই নয়। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস হইতে মহিয়সী নারিকুলের কাহিনী তাহাদিগকে শুনাইতে হইবে। অন্যদেশের ও এদেশের মেয়েদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থল ও বিরোধ স্থল কোথায় ও কতটুকু ও কেন তাহাও তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

এইরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে পারিলেই তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাই দেওয়া হইবে। তাহাতে তাহাদের চরিত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের হাওয়াও বদলাইয়া যাইবে, পুরুষেরাও নূতন শক্তিতে মাতিয়া উঠিবে।

(১১)

মেয়েদের এত শিক্ষা ও এরূপ শিক্ষা কখন দিব, কেমন করিয়া দিব, এরূপ প্রশ্ন স্বভাবত মনে আসিতে পারে। যে দেশে বার তের বৎসর বয়সেই মেয়েদের বিবাহ এবং পনের ষোল বৎসরেই মাতৃত্ব-লাভ হয়, সে দেশে এত জিনিষ শিখিবার অবসর মেয়েদের কোথায় ? ঠিক কথা।

মেয়েদের বিবাহের, কাজেই মাতৃত্বলাভেরও, বয়স আস্তে আস্তে বাড়িয়া যাইতেছে। এখন তো পনের ষোল বৎসর বয়সেও মেয়েদের বিবাহ হইতেছে দেখিতেছি। তাহাতে সমাজে স্পষ্ট নিন্দাও শুনি না। কাযেই মেয়েদের বিবাহের বয়স শীঘ্রই যে বার তের ছাড়াইয়া পনের ষোলয় দাঁড়াইবে, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

সব শিক্ষাই যে মেয়েদের বিবাহের পূর্ব্বেই শিখিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। স্বাস্থ্যতত্ত্বের এমন অনেক কথা আছে, যাহা তাহারা বিবাহের পূর্ব্বে শিখিতে পারে না। যেমন, সুপ্রজনন বিদ্যা। তাহা তাহারা বিবাহের পরেই শিখিবে। বিবাহের পূর্ব্বে যতটা বিদ্যা শিখিতে পারে শিখিবে, বিবাহের পর আবার শিখিতে থাকিবে। বিবাহের সঙ্গে শিক্ষা শেষ না করিলেই হইল। ছেলেরা তো এখন বিবাহের পরও পড়ে, মেয়েরাই বা সেরূপ করিবে না কেন ?

অবরোধ-প্রথার জন্য তাহারা বিবাহের পর স্কুল পাঠশালায়

যাইতে পারিবেনা সত্য; কিন্তু বাড়ীতে স্বামী আছেন, শ্বশুর আছেন, দেবর আছেন, তাঁহাদের কাছেও তো শিক্ষা করা চলিবে। শ্বশুরের সঙ্গে কথা কহার অভ্যাস অনেক বাড়ীতে নাই, কিন্তু তা সু-অভ্যাস নয়। যাঁহাকে বাবা বলিব, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে দোষ কি?

তাছাড়া, পাড়ায় পাড়ায় যদি এক একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন, তিনি যদি দ্বিপ্রহরের অবসর কালে পাড়ার একজনদের বাড়ীতে বসিয়া কথাচ্ছলে, গল্পচ্ছলে, পাড়ার সকল মেয়েদের শিক্ষা দিতে থাকেন অথবা সন্ধ্যার সময় কোন পুরুষ কথক গ্রামের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সামনে গ্রামবধূদের শিক্ষা দিতে থাকেন, তাহা হইলেও তো কায হয়।

শুধু তাই বা কেন? মেয়েরা নিজেরাও তো ভাল ভাল বই কিনিয়া বা যোগাড় করিয়া পড়িতে ও বুঝিতে পারে। নভেল পড়িবার অবসর হয়, তাহা কিনিবার পয়সা জোঠে, অথবা তাহা যোগাড় করিয়া লইবার চেষ্টা থাকে, আর পূর্ব্বোক্তরূপ আবশ্যক বইগুলি যোগাড় করিতেই তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইবে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

মেয়েদের শিক্ষা যদি ছয় বৎসর বয়সেই আরম্ভ করা হয় আর যদি তাহাদের বিবাহ তের বৎসর বয়সেই হয় এইরূপ ধরিয়া লই, তাহা হইলে তো বিবাহের পূর্ব্বে তাহারা শিক্ষার জন্য অন্তত

সাত বৎসর সময় পায়। এই সাত বৎসরে শিক্ষার একটা পাকা বনিয়াদ তৈয়ারী করা বড় বেশী কঠিন কি?

ছেলেরা যদি তের বৎসর বয়সে প্রবেশিকা না হউক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, মেয়েরাই বা সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে না কেন? মেয়েরা তো বুদ্ধিতে ছেলেদের অপেক্ষা কম যায় না, তবে তাহারা পারিবে না কেন?

প্রথম হইতে রুটিন্ ঠিক করিয়া লইয়া যদি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়, তাহা হইলে এই সাত বৎসরে নানাবিষয়ে মোটামোটি জ্ঞান মেয়েদের বেশ ভাল করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সাত বৎসর সময় বড় কম নয়। পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা না বাড়াইয়া গল্পচ্ছলে বা কথাচ্ছলে শিক্ষা দিতে থাকিলে, বিষয় বিশেষে কতকগুলি পরীক্ষা দেখাইতে পারিলে শিক্ষা কাযটা মেয়েদের প্রীতিপ্রদও হইবে, সহজসাধ্যও হইবে। সব জিনিষই যে পুস্তকের সাহায্যে শিখাইতেই হইবে এমন কোন কথা নাই।

মেয়েরা অঙ্ক শিখিবে কি না? অবশ্যই শিখিবে। বীজগণিত বা জ্যামিতি শিখুক বা না শিখুক, পাটীগণিত তো তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতেই হইবে। জীবনের প্রতিপদেই, গৃহস্থের প্রতি কাযেই, পাটীগণিতের সাহায্য দরকার হয়। তারপর অঙ্কে যদি মাথা কাহারও খুলিয়া যায়, তাহাতে যদি কাহারও বেশী ঝোঁক দেখা যায়, তাহা হইলে সে ক্রমে বীজ-গণিত প্রভৃতিও শিখিতে পারে। কোন আপত্তি নাই।

বিজ্ঞানও তাহারা পড়িবে। তবে বইএর সাহায্যে নয়। গল্প শুনিয়া ও চোখে পরীক্ষা দেখিয়া। স্বাস্থ্যতত্ত্বও তাহারা ঐরূপে শিখিবে।

সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব প্রভৃতির কতক তাহারা পুস্তকের সাহায্যে আর কতক গল্পচ্ছলে শিখিবে। ইতিহাস সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। ভূগোলের সূক্ষ্মসংবাদগুলি তাহা-দিগকে জানিতে হইবে না। ভূগোল তাহারা মানচিত্র দেখিয়া মুখে মুখেই শিখিবে, ভূগোল সম্বন্ধে তাহারা একখানা পুস্তকও পড়িবে না। পুস্তকের সাহায্যে ভূগোল পড়িতে গেলেই ভূগোল শিক্ষা অতি কঠিন কায হইয়া উঠে।

মেয়েদের সঙ্গীত শিখাইতে অনেকেরই আপত্তি আছে। পশ্চিম বাঙ্গালার বাহিরে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, পর্ব্ব উপলক্ষে মেয়েরা নাচ-গান করিয়া থাকে। মেয়েদের এরূপ নাচ-গান যে খারাপ কায তা' নয়। তবে পশ্চিম বাঙ্গালার লোকের নিকট তাহা নূতন ঠেকে বলিয়াই তাহারা উহার পছন্দ করে না। জীবনে গান বাজনার প্রয়োজন আছে। অবসাদ দূর করিবার পক্ষে ইহাদের উপযোগিতাও কম নয়। প্রাচীনকালে নৃত্যগীত না জানা মেয়েদের অগৌরবের বিষয় ছিল। এখন সেদিন দুর্ভাগ্যক্রমে চলিয়া গিয়াছে।

চিত্রাঙ্কন শিখাও মেয়েদের উচিত। পূর্ব্বে মেয়েদের চিত্র আঁকিতে শিখিতেই হইত, তাহা তাহাদের লক্ষ্মীপূজার সময়ই

জানিতে পারা যায়। এ বিদ্যাটি নিতান্ত অকারণেই তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। নাচগানে যদি বা কোন গৃহস্থের আপত্তি থাকে, মেয়েদের ছবি আঁকিতে শিখায় আপত্তি থাকা উচিত নয়। ছবি আঁকিতে যে আমোদ পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্বতো-ভাবেই নির্দ্দোষ। মেয়েদের সে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

গান-বাজনা, ছবি-আঁকা শুধু মেয়েদের কেন ছেলেদেরও যত্ন করিয়া শেখা উচিত। নির্জ্জনতার কষ্ট দূর করিতে এই দুই বিদ্যার মত বিদ্যা আর নাই। অথচ জীবনে নির্জ্জনতা অনেকবারই ঘটে। যার-তার সঙ্গ করা অপেক্ষা নির্জ্জনে থাকা সহস্রগুণেই ভাল। তখন সময় কাটাইবার জন্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকিলে ও গান বাজনা করিলে মনে অবসাদ আসিতে পারিবে না; মনে বেশ স্ফর্ত্তি, বেশ উত্তেজনা, সর্ব্বদা জাগিয়া থাকিবে।

(১২)

ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পত্তনটাই সবচেয়ে কঠিন। তাহা-দিগকে বর্ণশিক্ষা ও শব্দশিক্ষা দিতেই বিষম বেগ পাইতে হয়। তারপর ঠিকভাবে বাক্য পড়ানোও সহজ কথা নয়। যতদিন না তাহারা অর্থবোধ করিতে পারিতেছে, ততদিন পড়ার জন্য তাহাদের মনে কোনরূপ টান জন্মিতে পারে না।

বর্ণশিক্ষা ও শব্দশিক্ষা সহজ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেকেই অনেক পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। আমার মনে হয় নিম্নোক্ত পন্থাটীই বেশ।

আগে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শিখাইয়া তবে শব্দ পড়িতে শিখান হয়; সেরূপ না করিয়া ঐগুলি শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ পড়িতে শিখান ভাল। যেমন, গগ, নগ, পব, শয়, আন, বন, মল, হল, তন, অত, ইত, অই ইত্যাদি।

আগে অ-আ তারপর ক-খ না শিখাইয়া মিশালভাবে শিখাইলেই ভাল হয়। যে অক্ষরগুলির রূপ কতকটা একরূপ বা কাছাকাছি, সেই অক্ষরগুলি আগে শিখান উচিত। যেমন, ত অ আ। ও ঔ। এ ঐ ঞ। ঢ ট ঠ। হ ই ঈ। থ খ। ড ঙ উ ঊ জ্ঞ। ব র ক ধ ঝ ঋ। ফ য য় ষ। ইত্যাদি।

যেমন ত, অ, আ, ও, ঔ, ইত্যাদি শিখা হইবে, অমনি শব্দ শিখান আরম্ভ হইবে। যেমন, তত, তথ, হত, ইত, ডত, উত, ঊত, আত, আউ, ইত্যাদি। শব্দগুলির যে কোনরূপ মানে থাকিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই।

এইরূপে বর্ণ ও শব্দ শিক্ষা চলিতে চলিতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ যেমন শিশুদের আয়ত্ত হইবে, অমনি তাহাদের একেবারে শিখান হইবে—কা, খা, গা, ঘা, চা, ছা, এবং কাক, কাকা, খাখ, খাখা, গাগ, গাগা ইত্যাদি।

'ক এ আ = কা' এইরূপ শিখাইবার কোন আবশ্যকতা নাই।

'া' থাকিলেই 'আ' উচ্চারণ করিতে হয়, এরূপ শিখানই ঠিক। 'আ' হইতে 'া'র উৎপত্তি বরং বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু 'ই' হইতে 'ি', 'ঈ' হইতে 'ী' প্রভৃতি বুঝান একেবারেই কঠিন। সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া একেবারে—

কা, খা, ইত্যাদি, পরে কি, খি ; কী, খী ; কু, খু ইত্যাদি শিখান ভাল। ইহাতে তাহাদের ভুল শিখিবার সম্ভাবনা অল্প।

প্রথমে তাহারা দুই অক্ষরের শব্দ শিখিবে। তারপর তিন অক্ষরের, চারি অক্ষরের শব্দ শিখিবে।

অক্ষর-শিখার সঙ্গে সঙ্গেই এইরূপ শব্দ শিখা চলিবে।

ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যোগ হইয়া যে সকল যুক্তাক্ষরের সৃষ্টি হয়, সেগুলি তাহাদিগকে আদৌ শিখান হইবে না, সেগুলি আলাদা ভাবে রাখিয়াই পড়ান চলিতে থাকিবে। যেমন, 'তপ্ত' না শিখাইয়া শিখান হইবে—তপ্‌ত ; ঐরূপ—

অন্ন—অন্‌ন

বর্ণ—বর্‌ণ

ধর্ম্ম—ধর্‌ম

বুদ্ধি—বুদ্‌ধি

পণ্ডিত—পণ্‌ডিত

রত্ন—রত্‌ন

যথেষ্ট—যথেষ্‌ট

শুক্ল—শুক্‌ল

কেবল বফলা, রফলা, যফলা ও মফলা ঐরূপভাবে আলাদা আলাদা করিয়া শেখান কঠিন। কারণ—কাম্য যদিও কাম্‌য, তথাপি উহার উচ্চারণ কাম্‌য না হইয়া কাম্ম (কাম্‌ম্)। 'জ্ঞ' ও 'ক্ষ' সম্বন্ধে ঐ কথা। এরূপ সব যুক্তাক্ষর এখন না শিখাইয়া পরে আবশ্যক মত এক একটি করিয়া শিখাইলেই যথেষ্ট হইবে।

শব্দ পড়িতে শিখিলেই তাহারা বাক্য পড়িতে শিখিবে। তাহাদের জন্য যে-সব বই লিখিতে হইবে, সেগুলিতে একটীও যুক্তাক্ষর থাকিবে না, যুক্তাক্ষর আসিয়া পড়িলে, তখনই তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

"রাম নামে এক রাজা ছিল। তার রাণী ছিল সীতা। সীতা বড় শান্‌ত মেয়ে। সীতাকে সবাই বড় ভালবাসিত ইত্যাদি।"

এইরূপে বাক্য পড়িতে একটু অভ্যাস হইলেই ছেলেমেয়েরা তাহাদের প্রিয় ছড়াগুলি পড়িতে আরম্ভ করিবে। যথা—

"আয় বিষ্‌টী ঝেঁপে
ধান দেব মেপে।"
"যা বিষ্‌টি থেমে যা
নেবুর পাতা করমচা।"

"আগ্‌ডোম্ বাগ্‌ডোম্ ঘোড়াডোম্ সাজে
ঢাক ঢোল মৃদঙ্ ঘাঘর বাজে
বাজতে বাজতে চল্‌ল ডুলি
ডুলি গেল কমলা পুলি

কমলাপুলির টেটা সুয্যি মামার বেটা
হাড় মড়্ মড়্ কেলেজিরে
উম্বুন কুম্বুন পানের বীড়ে
একটী পান ফোঁপরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া
হলুদবনে কলুদ ফুল
সূয্যি নামে টগরের ফুল।"

তারপর তাহারা পড়িবে, ঠাকুমা-দিদিমার নিকট রোজ সন্ধ্যার সময় তাহারা যে-সব গল্প শুনে।

"এক ছিল রাজা, তার ছিল এক রাণী। রাণীর ছেলে হয় না, পুলে হয় না। রাণীর মনে ভারি কষ্‌ট। একদিন রাজার বাড়ীতে এক ভিখারী এল। বলিল ভিখ্‌খা পাই মা।" ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, রু, গু, শু, হৃ এরূপ না শিখাইয়া, র্ু, গ্ু, শ্ু, হ্ৃ এইরূপই শিখান হইবে আর ছেলেমেয়েদের বইএও এইরূপ লিখা হইবে।

এইরূপ সব প্রাথমিক বইএ শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণ রক্ষা করিবার চেষ্টা না করাই ভাল। মন্ত্রী অপেক্ষা 'মোন্‌তিরী' লিখিলেই ছেলেমেয়েরা সহজে বুঝিতে পারিবে।

তারপর বাক্যপড়া সড়গড় হইলে তাহারা সংস্কৃত বানানের শব্দযুক্ত বাক্য পড়িতে শিখিবে। তখন 'মোন্‌তিরী' না পড়িয়া তাহারা বইএ মন্ত্রীই পড়িবে।

এই সময় হইতেই তাহারা পুরাণ ও ইতিহাস হইতে সংগৃহিত ও সহজ ভাষায় লিখিত চরিতাবলী পড়িবে। মেয়েরা পড়িবে, সীতা-সাবিত্রী প্রভৃতির কাহিনী আর ছেলেরা পড়িবে, রাম-অর্জ্জুন প্রভৃতির কাহিনী।

এই সময় তাহারা যে ইতিহাস শিখিবে, তাহার কতক জীবন-চরিতের ভিতর দিয়া আর কতক মুখে-মুখে শুনিয়া।

বিজ্ঞানের সহজ পরীক্ষাগুলি তাহারা প্রথম হইতেই দেখিবে, তাহাতে তাহাদের আমোদ বাড়িবে, শিক্ষাটাও তেমনি প্রীতিপদ হইবে। এ যেন ম্যাজিক দেখা গোছের হইবে।

এইরূপ ভাবে পড়ান চলিলে বই পড়িতে ছেলেমেয়েদের যে বিরক্তি দেখা যায়, তাহা অনেকটা লোপ পাইবে।

(১৩)

সৎসঙ্গের অভাব দূর করিবার জন্যই সদ্‌গ্রন্থ পাঠের আবশ্যকতা। কিন্তু লিখিতে পড়িতে শিখিয়া কেহ যদি সদ্‌গ্রন্থ না পড়িয়া কুগ্রন্থ পড়িতে থাকে, তাহা হইলে লেখাপড়া শেখায় সুফল না হইয়া কুফলই হইয়া থাকে।

কুগ্রন্থ কোন অবস্থাতেই পাঠ করা উচিত নয়। আমরা যাহা কিছু পড়ি, তাহারই একটা ছাপ—আমরা খেয়াল করি আর নাই করি—আমাদের মনের উপর লাগিয়া যায়। ভাল বই

পড়িলে ভাল ছাপ উঠিবে, খারাপ বই পড়িলে খারাপ ছাপ উঠিবে।

মনে যদি বরাবর খারাপ ছাপ উঠিতে থাকে, তাহা হইলে মনও সেই ছাপের অনুযায়ী ভাবে গড়িয়া উঠে। মনের গতি খারাপের দিকে একবার যদি যায়, তাহা হইলে মনের রাশ টানিয়া রাখা কঠিন। কঠিন এইজন্য যে, মানুষ যতই এগিয়ে আসুক না কেন, তাহার পশুভাবটা এখনও তাহার ভিতরে গজগজ করিতেছে। এই পশুভাবটাকে সে যতটা দমন করিয়া রাখিতে পারে, ততই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। এই পশু ভাবটা মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার জন্য সর্ব্বদাই ছট্‌ফট করিতেছে। এরূপ অবস্থায় তাহাকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তাহা হইলে ফল যে কি ভীষণ হয়, তাহা কল্পনার প্রয়োজন নাই—নিত্যই তো চোখে দেখিতেছি।

লোকে যে নেশাখোর হয়, বদখেয়ালি করিতে শিখে, তাহার কারণ ঐ পশুভাবটা। ঐ পশুভাবটাকে দমনে রাখিবার শক্তি যে হারায় তাহারই অধঃপতন হয়। কুসঙ্গ করিলে, কুগ্রন্থ পড়িলে, কুচিত্র দেখিলে মনের পশুভাবটা প্রবল হইয়া উঠিবেই উঠিবে।

কুসঙ্গের মত শত্রু আর নাই। কুসঙ্গ বলিতে কেবল কুলোকের সঙ্গ নয়, কুগ্রন্থ পাঠ, কুচরিত্র দর্শন, কুকথার আলোচনা সবই বুঝায়।

জেলখানা দেখার ভাগ্য যদি কাহারও হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে জানে, কুসঙ্গের প্রভাবে মানুষ কত নীচ হইয়া যায়। জেলখানায় যাহারা আসে, তাহারা সাধারণত তিন প্রকার লোক। এক প্রকার লোক আসে, যাহারা বাস্তবিকই দোষী ; জেলখানাই যাহাদের ঘর-বাড়ী, বাহিরে যাহারা এক একবার হাওয়া খাইতে যায় মাত্র। ইংরেজীতে তাহাদিগকে 'জেলবার্ড' (জেলের পাখী) বলে। আর এক প্রকার লোক আসে, যাহারা পাকা বদ্‌মায়েস নয়, কুসঙ্গে পড়িয়া লোভের বা রাগের বশে একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সে জন্য অনুতাপ করে। এই শ্রেণীর লোক কিছু দিন জেলে বাস করিতে করিতে পাকা বদ্‌মায়েসদের সংস্পর্শে আসে ও সঙ্গদোষে তাহাদের প্রকৃতিলাভ করে অর্থাৎ তাহারাও পাকা বদ্‌মায়েস হইয়া উঠে। জেলে তাহারই সম্মান বেশী, যে বেশী বদ্‌মায়েস, যে বেশী বছর জেল খাটে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির। দারোগার প্ররোচনায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি না হওয়ায়, কি তাহাদের বাড়ীতে চুরি বা ডাকাতি হইয়াছে পুলিশে সংবাদ দিয়া তাহা প্রমাণ করিতে না পারায় বা ঐরূপ কোন কারণে যাহারা জেলে আসে, তাহারা লোক ভাল হইলেও চিরকাল ভাল থাকিতে পারেনা। তাহারাও সঙ্গ দোষে জাল-জুয়াচুরি করিতে, নেশা করিতে, বদ্‌মায়েসি করিতে, মিথ্যা কথা বলিতে বেশ শেখে। তাহাদের জীবনের আদর্শও নীচ হইয়া যায়। তাহারা চালাক হইবার লোভে বদ্‌মায়েস

হইয়া উঠে। তাহাদের এই যে অধঃপতন ঘটে, তাহা তাহাদের অজ্ঞাতসারেই ঘটে, অতি আস্তে আস্তে ঘটে; তাহাদের যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা তাহারা টেরও পায় না।

আমি একটা লোকের কথা জানি। সে লোকটা ভদ্রবংশীয়, কি একটা সামান্য দোষে জেলে আসে। কিন্তু জেলে থাকিতে থাকিতে সে এমন পাকা বদ্‌মায়েস হইয়া উঠে যে, তাহাতে আর কলিকাতার গুণ্ডোতে কোন তফাৎ থাকে না। গুণ্ডোর বরং সাহস আছে, তাহার তাহাও থাকেনা। তাহার যে এতদূর অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা সে নিজেই জানেনা আর জানেনা বলিয়াই ভদ্রলোক দেখিলেই তাহার সঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হয় ও নিজকে ভদ্রলোক বলিয়া চালাইতে চাহে। তাহার সেই চেষ্টা হইতেই তাহাকে চিনিবার বেশ সুযোগ পাওয়া যায়। একবার একটা লোক কিছু ধান চুরি করিয়া হাজতে আসে। লোকটা একরারী (যে দোষ স্বীকার করে, তাহাকে একরারী বলে); তাই তাহাকে হাজত ঘরে না রাখিয়া গুণাখানায় (ইংরেজীতে যাহাকে সলিটরি সেল বলে সেইখানে) রাখা হয়। সে গুণখানায় আসিলে তাহার সহিত ভদ্রবদ্‌মায়েসটীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হয়।

ভদ্র—কি করিয়াছ ?

চোর—চুরি।

ভ—কি চুরি ?

চোর—ধান।

ভ—কত ?

চো—আধমণ।

ভ—আধমণ! কয়জনে ?

চো—চারিজনে।

ভ—চারিজনে আধমণ ধান চুরি! দূর শা—চোরের নামে বদনাম দিলি।

সে যে কি অবস্থায় পড়িয়া চুরি করিয়াছে, তাহা জানিবার চেষ্টা নাই, তাহার আবশ্যকতা-বোধও নাই! সে যে অপর তিনজনের সহিত মিলিয়া বেশী চুরি করে নাই, মাত্র আধমণ ধান চুরি করিয়াছে, ইহাই তাহার মস্ত অপরাধ। চুরি করিয়াছে বেশ করিয়াছে। কিন্তু চুরি করিল যদি, ভাল করিয়া—বেশী করিয়া—করিল না কেন ? তাহার মত আহাম্মক চোর আর কেহ আছে কি ? ভদ্র বদ্‌মায়েসটির ইহাই মনের ভাব।

আরও বহুব্যক্তির কথা জানি, যাঁহারা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত, যাঁহারা কোন নীচ কাযের জন্য নয় পরের হিত খুঁজিতে যাইয়াই জেলে গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই বাহিরে কখনও নেশা করিতেন না, বরং নেশার বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা পর্য্যন্ত জেলে গিয়া সঙ্গদোষে নেশা করিতে শিখেন, মিথ্যা কথা বলিতে শিখেন, বেশ অসরল হইয়া উঠেন। অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে ব্যতিক্রম-স্থল যে কেহ নাই, তাহা নয়, সেরূপ অনেকেই

আছেন। কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়া তো বিচার হয় না, বিচার হয় সাধারণ দিয়াই।

তাঁহাদের কথাই বা বলি কেন? যাঁহারা বিনা দোষে বিনা বিচারে জেলে আটক ছিলেন, তাঁহারাও অনেকে যে সঙ্গদোষে মিথ্যাকথায় বেশ অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, নূতন করিয়া নেশা করিতে শিখিয়াছিলেন, তাহা গোপন রাখিয়া লাভ নাই।

জেলে গেলে মানুষ যে ক্রমে ক্রমে কিরূপ নীচ হইয়া যায়, তাহা দিনকতক জেলে না থাকিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। এটা জেল-যায়গাটার দোষ নয়, দোষ অসৎসঙ্গের। সর্ব্বদা কু-লোকের সঙ্গ করিতে থাকায়, মানুষ আপনিই নীচ হইয়া যায়। সে-নীচতা হইতে আত্মরক্ষা করা নিতান্ত সামান্য কথা নয়, সামান্য শক্তির পরিচয় নয়।

জেলে ঢুকিবামাত্র যেসব দৃশ্য চোখে পড়ে, তাহাতে সকলেরই মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। কিন্তু কিছু দিন সেই দৃশ্য অনবরত দেখিতে দেখিতে তাহা আর চোখে লাগে না, মনে আঘাত দেয় না। তখন তাহা চোখে ও মনে বেশ সহিয়া যায়; তখন তাহা একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়াই তাহার প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব আসে এবং অনেক সময় সেসবের সমর্থন করিবারও প্রবৃত্তি জন্মে।

সুসঙ্গের ফল হয়ত এরূপ দ্রুত হয় না। না হইবারই কথা, মানুষ জোর করিয়া পশু হইতে মানুষ হইতেছে। ভাল হইতে

হইলে তাহাকে জোর করিয়া হইতে হয়। উপরে উঠিতে গেলেই জোর লাগে, সাবধানতা আবশ্যক হয়। নিজের উপর সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে মানুষ কিছুতেই মনুষ্যত্ব বজায় রাখিতে বা তাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারেনা। তার উপর আবার পশু ভাবটা তাহাকে নিয়তই নীচের দিকে টানিতেছে। এই টানাটানির সংগ্রামের মধ্যে যে সাবধান না থাকে, তাহার পা পিছলাইবেই, সে পড়িয়া যাইবেই, তাহার পশুভাবটা প্রবল হইয়া উঠিবেই। কাজেই নীচের দিকে ছুটিবার জন্য চেষ্টার আবশ্যকতা নাই, তাহা সহজেই ঘটিতে পারে। যাহা সহজে ঘটিতে পারে, তাহাতে যদি আবার কুসঙ্গ আসিয়া জুঠে, তাহা হইলে তো আগুনে ঘি দেওয়ার মত হয়, পতনের প্রবণতা বহুগুণে বাড়িয়া যায়।

এইজন্য কেবল লেখা পড়া শিখিলেই হয় না। যাহাতে সুগ্রন্থপাঠে শিশুদের প্রবৃত্তি জন্মে তাহাই যত্ন করিয়া করিতে হয়। কুগ্রন্থের প্রতি একটা বিদ্বেষ তাহাদের মনে আশৈশব জন্মাইয়া না দিলে পরে তাহাদের চরিত্র রক্ষা করা সম্ভবপর না হইতেও পারে। সেহিসাবে মূর্খ থাকা বরং ভাল, তথাপি লেখা পড়া শিখিয়া কুগ্রন্থ পাঠ করা একেবারেই উচিত নয়।

কিন্তু আমি মূর্খতার পক্ষপাতী নই। কেহ মূর্খ থাকুক ইহা আমি পছন্দ করি না। সকলে জ্ঞানলাভ করুক, লেখাপড়া শিখিয়া নিজের চেষ্টায় ভাল ভাল বই পড়িতে শিখুক, ভাল ভাল বই পড়িয়া নিজেদের চরিত্র উন্নত করিয়া তুলুক, ইহাই

আমার কামনা। ভাল ভাল বইএর তো অভাব নাই। সেই বই গুলি বাছিয়া লইয়া যদি প্রথম হইতে শিশুদের চোখের সামনে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহারা ভাল বই পড়িতেই শিখিবে, তাহাতে তাহাদের রতি জন্মিবে, তাহারা কখনও খারাপ বই পড়িতে চাহিবে না, পাইলেও পড়িবে না, কেহ জোর করিয়া পড়াইতে চাহিলেও তাহাদের ভাল লাগিবে না।

ভাল বই বিচার করিবার সময় কেবল ভাষার চটকের দিকে চাহিলে হইবে না, বিষয়ের দিকে নজর রাখিতে হইবে। অমুক বড়লোক এই বই লিখিয়াছেন, সুতরাং ইহা ভাল, এরূপ বোধও অন্যায়। অমুকের এই বইটী খুব ভাল সুতরাং তাঁহার ঐ বইটীও ভাল, এরূপ অপ-বিচারও ঠিক নয়। বইএর লেখক কে সে দিকে নজর না দিয়া আলোচিত বা বর্ণিত বিষয়টীর দিকে নজর না রাখিতে পারিলে ভাল বই বাছিয়া লওয়া সম্ভবপর হইবে না।

তাছাড়া, বয়স হিসাবেও ভালমন্দের বিচার আলাদা হয়। বুড়োদের যাহা ভাল তাহা শিশুদের পক্ষে ভাল না হইতেও পারে। সেটাও যেন ভাল বই বিচার কালে আমরা ভুলিয়া না যাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ নাটক-নভেলের নাম করা যাইতে পারে। নাটক-নভেল যত ভালই হউক, তাহা শিশুদের হাতে দিবার নয়। তবে, কেবল তাহাদের জন্য লিখিত যে সব নাটক-নভেল সেগুলির কথা আলাদা।

(১৪)

গ্রন্থপাঠের উদ্দেশ্য কেবল যে সৎসঙ্গের অভাব দূর করা তাহা নয়। গ্রন্থপাঠের আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। তাহা হইতেছে, চিন্তার বিষয় সংগ্রহ।

প্রত্যেক মানুষেরই চিন্তা করিবার শক্তি আছে। সেই শক্তি স্ফুরণ করা আবশ্যক। যে এই শক্তিকে রোধ করিবার চেষ্টা করে, সে মহাভুল করে। চিন্তার স্বাধীনতা থাকা চাই। সব বিষয়ই চিন্তা করা চলে। চিন্তা করিতে পিছানো কাপুরুষতা।

অনেকে ভক্তির দোহাই দিয়া চিন্তার স্বচ্ছন্দগতি রোধ করিতে চায়। কিন্তু তাহারা জানে না, ভক্তি তখনই সার্থক, যখনই তাহা চিন্তাদ্বারা শুদ্ধ। অন্ধভক্তি ভক্তি নয়। সে ভক্তির আপাত বেগ যাহাই থাকুক তাহার পরিণাম ভাল নয়। তাহা মানুষকে উন্নত না করিয়া অবনত করে। তাহাতে দলাদলির সৃষ্টি হয়।

ভক্তি যদি চিন্তার উপর—বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সে-ভক্তির আপাত বেগ অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও তাহা স্থায়ী হয়, কল্যাণকর হয়। তাহাতে দলাদলির সৃষ্টি হইতে পারেনা।

যাহা কিছু ঘর-পরের মধ্যে ভেদ আনিয়া দেয়, তাহাই মন্দ, তাহাই পাপ। অন্ধভক্তি পাপ। চিন্তা-প্রতিষ্ঠ ভক্তি যথার্থ ভক্তি, তাহাই পুণ্যজনক।

চিন্তার বিষয় যোগায় প্রকৃতি। কিন্তু গ্রন্থও কম বিষয় যোগায় না। চিন্তা করিতে গেলে, চিন্তার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা রাখিতে চাহিলে, চিন্তাকে অভিজ্ঞতা দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইতে হইলে গ্রন্থ পাঠ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। গ্রন্থে সহস্র সহস্র লোকের ও সহস্র সহস্র যুগের অভিজ্ঞতা লুকান আছে। সে অভিজ্ঞতা কি অগ্রাহ্য করিবার ?

প্রাচীন অভিজ্ঞতা অগ্রাহ্য করিলে, প্রতি কাযে নূতন করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে চাহিলে এক পাও এগোন যায়না, প্রতি পদেই বাধা পাইতে হয়। এরূপ বাধা ইচ্ছা-করিয়া সৃষ্টি করিয়া লাভ কি ?

সামান্য পরিশ্রম করিলেই যখন গ্রন্থ পাঠ করা যায়, প্রাচীন অভিজ্ঞতার সহিত পরিচিত হওয়া যায়, তখন সে কষ্টটুকু লইতে কাহারও সঙ্কুচিত হওয়া উচিত নয়।

যে পিতামাতা ইচ্ছা করিয়া বা অবহেলা করিয়া তাহাদের সন্তানকে গ্রন্থপাঠের অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, তাহারা কেবল নিজের নয়, সমাজেরও মহা অহিত করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা যে মহাপাপী তাহা না বলিলেও চলে।

একজন যুগাবতার বর্ত্তমান ভারতের দুরবস্থা অবলোকন করিয়া দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—ভারতের যে অধঃপতন, তাহার কারণ রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা নয়, তাহার কারণ বিদ্যাচর্চ্চার অভাব, জ্ঞানাকাঙ্ক্ষার লোপ ও চিন্তা করিবার আলস্য।

তাঁহার এই উক্তি আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। আমরা বাস্তবিকই চিন্তা করিতে চাই না। পরে যাহা-কিছু জোর করিয়া বলে, তাহাই সহজে মানিয়া লই, তাহা বিচার করিয়া দেখি না, দেখিতে চাহিনা। যাহা মনের মতন হয় তাহাই বিশ্বাস করিয়া লইতে আমাদের একটুকু দ্বিধা হয় না। আমরা অত্যন্ত কানপাতলা ও তরলপ্রকৃতির লোক।

আমাদের মধ্যে যদি বাস্তবিকই জ্ঞানচর্চ্চা থাকিত, তাহা হইলে আমরা সন্ন্যাসের এতদূর ভক্ত হইয়া উঠিতাম না, পারলৌকিক মুক্তির নামে এমন নাচিয়া উঠিতাম না, স্বর্গের লোভে দিনের মধ্যে তিন বার পুকুরে ডুব দিতাম না ও শুচির দোহাই দিয়া সকলকে নোংরা নোংরা করিয়া তফাৎ করিতাম না, মানুষে মানুষে এত ভেদের সৃষ্টি করিতাম না, ঘর-পরের আত্মীয়তা ভুলিয়া যাইতাম না।

আমরা যদি সত্যসত্যই জ্ঞানের পক্ষপাতী হইতাম, তাহা হইলে মূর্খ পুরুতেরা অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িয়া আমাদিগকে নিত্য ঠকাইত না, আর আমরাও তাহাদের পাদোদক পান করিবার জন্য এতদূর ব্যস্ত হইতাম না ; যে নেশাখোর, চরিত্রহীন, তাহাকে কেবল পৈতার খাতিরেই নিজের প্রতিনিধি করিয়া দেবতার সামনে বসাইতাম না এবং তাহার অপপূজাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আত্মপ্রসাদলাভ করিতাম না।

আমাদের মধ্যে যদি জ্ঞানচর্চ্চা থাকিত, তাহা হইলে যে রাষ্ট্রীয়

পরাধীনতাকে সকল দোষের আঁকর বলিয়া গালি দিই তাহা ঘটিতে পারিত না। নিজের সিংহাসন স্বেচ্ছায় অপরকে বিলাইয়া দিলে ফল যে কি হয়, তাহা কি আমরা কেহ কখন ভাবিয়া দেখিয়াছিলাম ? কতকগুলি জমিদার চক্রান্ত করিয়া যাহা খুসী করিল, আমরা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া তাহাই মানিয়া লইলাম। অদৃষ্ট এতই সস্তার জিনিষ !

আমাদের যদি জ্ঞান থাকিত, চিন্তার স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে আমরা কখনই নিজের অধঃপতনকে এমন করিয়া ডাকিয়া আনিতাম না, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিতাম না, তখনই স্বার্থান্ধ জমিদারদের ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজেদের সিংহাসন নিজেরাই রক্ষা করিতাম। কিন্তু জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে নিজেদের সিংহাসনের মর্য্যাদা আজও আমরা সকলে বুঝি নাই। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল্য কি তাহাও দেশের পনের আনা লোকের জানা নাই। আশ্চর্য্যের কথা, গত যুদ্ধের সময় দেশবাসীদের অনেকেই জর্ম্মনীর আক্রমণের সম্ভাবনাটাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেছিল। তাহাদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিত, জর্ম্মন আসিয়া তাহাদের সকল দুরবস্থা দূর করিবে। তাহাদের এই বোধ কোথা হইতে আসিয়াছিল, তাহা তাহারাই জানে। জর্ম্মনদের প্রকৃতির সম্বন্ধে কোন তথ্যই তাহারা রাখিত না। তথাপি জর্ম্মনীর ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরাধীনতা নয়, স্বাধীনতাই যে সকল দুরবস্থার রোধ করিতে

পারে, সেজ্ঞান তাহাদের ছিল না, এখনও নাই। দেশ যে স্বাধীন হইতে পারে বা কখন ছিল এ জ্ঞান তাহাদের নাই। স্বাধীনতা জিনিষটা যে কি তাহা তাহারা আদৌ বুঝে না। তাহাদের বিশ্বাস, বিদেশী এক রাজার পর বিদেশী আর একরাজা আসিবেন, নূতন রাজা পুরাতন রাজার চেয়ে সুখে আমাদিগকে রাখিবেন।

বুদ্ধির চালনা থাকিলে, জ্ঞানচর্চ্চা থাকিলে, ইতিহাসের দুইখানা পাতা উল্টাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি থাকিলে, এইরূপ অপ-বুদ্ধি দেশবাসীদের মধ্যে কখনই দেখা যাইত না।

অথচ মানুষ হইতে হইলে বুদ্ধির চালনা করিতে শিখা চাই, জ্ঞান লাভ করা চাই। কিন্তু গ্রন্থপাঠ ভিন্ন বুদ্ধি চালনার, জ্ঞান লাভের সহজ উপায় আর নাই। গ্রন্থ সকলেরই পড়া উচিত, সকলকেই পড়ানো উচিত। সেকালের ব্রাহ্মণেরা দেশের মধ্যে এই জ্ঞানচর্চ্চা বজায় রাখিবার ভার লইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। এখন আমাদের সকলকেই সেই ব্রাহ্মণপ্রকৃতি পাইতে হইবে।

(১৫)

শিশুদিগকে কেবল জ্ঞানচর্চ্চা করিতে শিখাইলেই যথেষ্ট হইবে না। তাহাদের শরীরটাও যথেষ্ট সবল করিয়া তুলিতে হইবে। শরীর সুস্থ ও সবল না থাকিলে মনকে সুস্থ ও সবল

রাখা যে কত কঠিন ব্যাপার তাহা আমরা সকলেই নিজের নিজের জীবনে অসংখ্যবার উপলব্ধি করিয়াছি। যখনই শরীর খারাপ হইয়াছে, শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে, তখনই মেজাজও বিগড়াইয়াছে ; সামান্য একটু কারণেই আমরা সাপের মত ফোঁস করিয়া উঠিয়াছি ; ধৈর্য্য ধরিবার এতটুকু ক্ষমতা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। খুব ক্ষুধার সময়ও ঠিক্ ঐরূপ হয়।

মনের সহিত যখন শরীরের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তখন শরীরকে উপেক্ষা করিয়া কেবল মনের উৎকর্ষ সাধিবার চেষ্টা করা ভুল। ভুল হইলেও আমরা আজকাল তাহাই করিতেছি। ফলে দুই পুরুষ আগে আমাদের যে-শরীর ছিল, এখন আমাদের সে-শরীর নাই। সে পুষ্ট বলিষ্ঠ শরীর আজকাল আর কয়টা দেখা যায়? অথচ তখন সে-শরীর ঘরে ঘরে ছিল। দেশে এত রোগও ছিল না। অম্বল রোগ তো তখন গালির কথা ছিল ; আর আজ তাহা আমাদের নিত্য সহচর। এখন এমন কয়জন লোক আছে যাহাদের এই রোগটা নাই? চোখের অসুখও কি ছাই কম? আজকাল তো অনেকেরই চোখে চশমা দেখি। সবই কিছু ঝুটা চশমা নয়।

আমাদের শরীরের এই যে অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহা আশার কথা নয়। অপটু শরীর লইয়া আমরা কেমন করিয়া ও কয়দিন জীবন-সংগ্রাম চালাইব? শরীরটাকে সবল করিয়া তুলিতেই হইবে। এতদূর সবল করিতে হইবে যে, মনের নিদেশ

পালিবার কালে শরীর যেন নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন না করিয়া বসে।

আমরা যদি শৈশব হইতেই শিশুদিগকে ব্যায়ামের দিকে নজর দেওয়াই, ব্যায়ামটা যে খুব ভাল কায তাহা বুঝাই, তাহা হইলে তাহাদের শরীর সহজেই আপনা হইতেই সবল হইয়া উঠিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনটাও স্ফূর্ত্তিমান্ হইবে।

কিন্তু কেবল নিজের ঘরের শিশুদের ব্যায়ামচর্চ্চার দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না, পরের শিশুদের শরীরের উন্নতির দিকেও সেই সঙ্গে নজর দিতে হইবে। ব্যায়ামচর্চ্চার একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। সেই আবহাওয়ার মধ্যে যে-কেহ থাকিবে, যে-কেহ আসিবে, সেই ব্যায়ামচর্চ্চার জন্য বেশ একটা উত্তেজনা বোধ করিতে থাকিবে। তবেই আমার ঘরের শিশুদের নিয়মিত-ভাবে ব্যায়ামচর্চ্চা করিতে থাকা সম্ভবপর হইবে, নহিলে নয়।

আমরা যদি পরের শিশুদের বাদ দিয়া, তাহাদের কথা স্মরণ না রাখিয়া কেবল নিজের নিজের শিশুদের শরীর সবল করিতে উদ্যত হই, তাহা হইলে দুইদিন পরেই দেখিব, আমাদের সে চেষ্টা পণ্ড হইয়াছে। ব্যায়ামের দিকে শিশুদের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক জন্মে নাই, তাহাতে তাহারা স্ফূর্ত্তি পায় না, যেন করিতে হইতেছে বলিয়াই করিতেছে। ফলে তাহাতে আঠা থাকে না, শরীরও ভাল করিয়া গঠিয়া উঠে না। ব্যায়ামেও নিয়মিত চর্চ্চার অভাব ঘটে।

কাজেই নিজের শিশুদের শরীর সবল করিতে হইলে পরের শিশুদের শরীরের প্রতিও বাধ্য-হইয়াই লক্ষ্য দিতে হয়। পরকে ছাঁটিয়া ফেলিবার চেষ্টা বৃথা। ছাঁটিতে গেলেই আমরা নিজেরা জব্দ হই।

শিশুদের কথা বলিতে আমি এখানে মেয়েদেরও বুঝিয়াছি। মেয়েদের ব্যায়ামচর্চ্চার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেকেরই আপত্তি থাকিতে হইবে, তাহাদের মনে হইতে পারে, মেয়েরা ব্যায়াম করিলে তাহাদের শরীরে পৌরুষভাব ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু তাহা ভুল। স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য। যেখানে স্বাস্থ্য নাই, সেখানে সৌন্দর্য্যও নাই। আমি রং ফরসার কথা বলিতেছি না। সৌন্দর্য্য বলিতে ফরসা রং বুঝায় না। তাহা যাহারা বুঝে, তাহারা ভুল বুঝে।

তারপর মেয়েদের শরীর সুস্থ থাকিলে সংসারে কত সুখ হয়, কত স্বাচ্ছন্দ্য আসে একবার ভাব দেখি। এই স্বাস্থ্যচেষ্টার অভাবেই তো মেয়েদের শরীর সহজে অপটু হইয়া পড়ে। আর মেয়েদের শরীর একবার অপটু হইলে সংসারে কিরূপ বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়ে তাহা কি আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না ?

ছেলেদের মত মেয়েদেরও কাজেই ব্যায়াম করিতে হইবে, নিয়মিতভাবে করিতে হইবে, শৈশব হইতে করিতে হইবে। না করিলে গত্যন্তর নাই। একবার পশ্চিমা মেয়েদের দিকে

চাহিয়া দেখ দেখি, তাহাদের শরীর কেমন পটু। সে পটু শরীর দেখিয়া হিংসা হয় না কি ?

য়ুরোপ-আমেরিকার মেয়েরাও তো ব্যায়াম করে, নিয়মিত ভাবেই করে, এমন কি বুড়া বয়সেও করে। তাহাদের শরীরে সৌন্দর্য্য কিছু কম কি ?

তাছাড়া, শরীর সবল থাকিলে কার সাধ্য মেয়েদের কোনরূপ অপমান করিতে সাহস পায়। মেয়েরা যদি নিজেরাই আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে পথে-ঘাটে তাহাদের অপমানের কথা এত শুনিতে হয় না। আর তাহাদিগকে লইয়া পথে-ঘাটে বাহির হইতেও মনে ভয় আসে না। এখন তো রেল-গাড়ীতেও তাহাদিগকে একলা বসাইয়া রাখিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হই না, প্রতি ষ্টেশনেই একবার করিয়া নামিয়া তাহাদের তত্ত্ব লইতে হয়। ইহা মেয়েদের পক্ষেও যেমন লজ্জার কথা, আমাদের পুরুষদের পক্ষেও তেমনি লজ্জার কথা।

আমরা তাহাদের কি করিয়া তুলিতেছি ? না দিতেছি মানসিক শিক্ষা আর না দিতেছি শারীরিক শিক্ষা। তাহারা আপনা-থেকেই দেশের প্রাচীন সংস্কারের গুণে যেটুকু শিক্ষা পায়, তাহাতেই তাহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। কিন্তু সে শিক্ষা আর কতটুকু ? তাহাতে আত্মরক্ষা চলে না, মনের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানও সম্ভবপর হয় না।

মেয়েদিগকে আর অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। কতকগুলি

ভ্রান্ত অপধারণার বশে আমরা যদি তাহাদের ব্যায়াম-চর্চ্চায় বাধা দিতে বসি, তাহা হইলে আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করিয়া বসিব। সুস্থ পিতামাতাই সুস্থ সন্তানের আশা করিতে পারেন, অপরে নহে। মাতা বা পিতা—যে-কেহ একজন—যদি দুর্ব্বল হন, রোগ-প্রবণ হন, তাহা হইলে তাঁহাদের শিশুও দুর্ব্বল ও রোগ-প্রবণ হইয়া জন্মায়। অন্তত তাহার শারীরিক বিকাশ খুব ভাল রকম হয় না।

মেয়েদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কেবল বর্ত্তমানের সম্পর্ক নয়, ভবিষ্যতের সম্পর্কও রহিয়াছে। তাহারাই ভবিষ্যৎ-বংশের জননী। বংশের মঙ্গল চাহিলে, মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে আমাদের নজর দিতেই হইবে। আর সে স্বাস্থ্য কেবল শারীরিক নয়, মানসিকও বটে।

আজকাল তো ডাক্তারদের মত এই যে, মা ও বাপের মন ও শরীর যেমন পুষ্ট হইবে, শিশুর শরীর ও মন ঠিক সেই অনুপাতেই পুষ্ট হইবে। তাঁহারা বহু পরীক্ষা করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন।

সাংসারিক সুখ-দুঃখের—স্বাচ্ছন্দ্য-অসাচ্ছন্দ্যের দিক্ হইতেই দেখি, আর ভবিষ্যৎ বংশের মঙ্গল-অমঙ্গলের দিক্ হইতেই দেখি, যে-দিক্ হইতেই দেখি না কেন, আমরা মেয়েদের শরীর ও মন উন্নত করিতে, পুষ্ট করিতে, সবল করিতে একান্তপক্ষেই বাধ্য।

সে-বাধ্যতা যে জানিয়া-শুনিয়াও মানে না, সে কেবল নিজের শত্রু নয়, বংশেরও শত্রু, সমাজেরও শত্রু।

(১৬)

শরীর পুষ্ট ও সবল করিতে হইলে নিয়মিত ব্যায়াম করা চাই-ই। কিন্তু একমাত্র তাহাই যথেষ্ট নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশটা আজকাল ম্যালেরিয়ার বীজে ভরিয়া গিয়াছে। এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পড়িয়া প্রতি বৎসরই লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাইতেছে আর যাহারা মারা যাইতেছে না, তাহারাও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে। দেশ হইতে এই ম্যালেরিয়ার বীজ দূর না করিলে আর চলিতেছে না। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া সম্ভবপর ?

কাহারও কাহারও মতে মশা মারার কল পাতিলেই ম্যালেরিয়া নষ্ট হইবে। মশাই ম্যালেরিয়ার বীজ বহন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া আসে।

বেশ কথা ; কিন্তু মশা মারিলেই তো ম্যালেরিয়ার বীজ নষ্ট হইতেছে না। বীজ নষ্ট করিলে মশায় আর কি ক্ষতি হইবে ? বাহকের দিকে এত নজর না দিয়া বীজ নষ্ট করার দিকে নজর দেওয়াই সঙ্গত মনে হয়।

কিন্তু এই বীজ নষ্ট করিতে হইলে সকলের সমবেত সাহায্য

ও সহানুভূতি আবশ্যক। কাহারও একলার এমন সাধ্য নাই যে উহা নষ্ট করিতে পারে।

পচাডোবা, পানাপুকুর, বন-জঙ্গল—এই গুলিই ম্যালেরিয়ার বীজ প্রসব করিয়া থাকে। যদি এইগুলির সংস্কার করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই দেশ হইতে ম্যালেরিয়া তাড়ানো খুবই সম্ভবপর হয়।

গ্রামের সকলে যদি একমত ও সমবেত হইয়া এই সংস্কারে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে দেশটাকে রক্ষা করা বেশী কঠিন কাষ বলিয়া মনে হয় না। য়ুরোপের অনেক যায়গায় তো দেখা গিয়াছে যে, ডোবা বুজাইয়া, পুকুর পরিষ্কার রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া এবং গ্রামের বন-জঙ্গল সাফ করিয়া কোথাও ফুলের বাগান আর কোথাও বা 'পার্ক' বা বেড়ানোর বাগান তৈয়ারি করিয়া গ্রামবাসীরা গ্রামের অস্বাস্থ্যতা একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে। আমরা কি তাহা পারিনা ?

অনেক নদীর মুখ বুজিয়া যাওয়ায় গ্রামের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু নদীর মুখ যতই বুজুক, গ্রামবাসীরা যদি বাস্তবিকই আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করে, তাহা হইলে নদীর জল পরিষ্কার রাখা তাহাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয় না। তাছাড়া, আজকাল তো বাঙ্গালা সরকার প্রতি বৎসর নদীর সংস্কারের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়; কোথাও কোথাও তাঁহারা কাযও আরম্ভ

করিয়াছেন। গ্রামবাসীরা যদি নিজেরা সাধ্যমত চেষ্টা করে আর তাহাদের সাহায্যের জন্য সরকারের সহযোগিতা প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাদের সে প্রার্থনা সর্ব্বত্র না হউক কতক কতক স্থলে নিশ্চয়ই সফল হইবে।

ম্যালেরিয়া দূর করিবার আর একটী উপায়, সর্ব্বদা পরিষ্কার জল পান করা। জল সম্বন্ধে আমরা বড়ই উদাসীন। যে-জলে বাসন মাজি, মেয়েরা মূত্রাদি ত্যাগ করে, পুরুষেরা জলশৌচ করে, আবার সেই জলেই আমরা স্নান করি, রান্না করি, কেবল তাই নয় তাহা পান করি। সে জল ফুটাইয়া নির্দ্দোষ করিয়া লইবার চেষ্টাটুকুও করি না। গ্রামে মড়ক হইলে সেই জলেই ময়লা বিছানাপত্র ধুই, কাপড় কাচি। ইহাতে আর ব্যাধি ঠাকরুণের অপরাধ কি? যাহাকে আমরা আদরে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে তুলিয়া আনি, তাহাকে আসার জন্য দোষ দিতে গেলে চলিবে কেন? সে যাহাতে আসিতে না পারে আমাদের তো তাহাই করা আবশ্যক।

প্রতি গ্রামেই যদি বিভিন্ন কাজের জন্য আলাদা আলাদা পুকুর থাকে, তাহা হইলে রোগ মহাশয় অত সহজে আমাদিগকে কাবু করিতে পারে না। যে-পুকুরের জল পান করিতে হইবে, সে-পুকুরের জলে কেহই কাপড় কাচিতে, স্নান করিতে বা তাহা অন্য কোনরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

স্নানের জন্য আলাদা পুকুর রাখিলেই ভাল হয়।

বাসন পুকুরে না মাজিয়া পুকুর হইতে দূরে-কোথাও তোলা জলে সারিলে স্নানের পুকুরও নষ্ট হইতে পায় না। কেবল বাসন মাজার জন্য আলাদা পুকুর রাখা তো সর্ব্বত্র সম্ভবপর নয়, তোলা জলেই যখন কায চলে তখন তাহার আবশ্যকতাই বা কি?

শৌচাদি কার্য্য কখনই পুকুরে করিতে নাই।

অপরিষ্কার কাপড়-চোপড় ও বিছানাপত্র তোলা জলে পরিষ্কার করাই উচিত। মাঝে মাঝে সেজন্য গরম জল ব্যবহার করা আবশ্যক।

যে-দেশে রোগ-বীজ নাশক সূর্য্যদেবের এমন প্রখর দৃষ্টি, সেদেশে এত রোগের বাহুল্য প্রকৃতির দোষ নয়, আমাদেরই লজ্জার কথা।

আমরা বাস্তবিকই এমন অলসপ্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছি যে, যে-কাযটা করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি, তাহাতেও হাত দিতে চাই না। পরে যদি সে-কাযটা করিয়া দেয়, তাহা হইলে ভারি খুসী হই। (অনেক সময় আবার মনে মনে খুসী হইলেও মুখে নিন্দা করিতে ছাড়ি না।)

কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে আমাদের প্রকৃতি ঠিক্ এইরূপ ছিল না। আমরা তখন নিজের হিতের সঙ্গে পরের হিতও খুঁজিতাম। যেখানে নিজের কোন লৌকিক হিত দেখিতে পাইতাম না,

সেখানে পারলৌকিক হিতের কল্পনা করিয়া লইতাম। এই জন্যই পুকুর কাটানো, রাস্তা বাঁধানো, রাস্তার ধারে ধারে গাছ বসানো ও পান্থশালাস্বরূপে মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা করা অতি পবিত্র কায বলিয়া মনে করিতাম। তখন এই সব কায করিতে পারিলেই আমরা নিজেদের ধন্য ভাবিতাম। আর, এই সব কাযে ধন ব্যয় করিতে পারিলেই ধনীরাও নিজেদের ধনব্যয় সার্থক হইল, এরূপ মনে করিতেন।

একটা কাহিনী মনে পড়িতেছে। শিয়াখালার কিছু দূরে পাতুল-সন্ধিপুর নামে একটী গ্রাম আছে। কয়েক পুরুষ আগে সেই গ্রামে গোবর্দ্ধন রক্ষিত নামে একব্যক্তি বাস করিতেন, তাঁহার কিছু পয়সা-কড়ি ছিল। একবার কতকগুলি স্ত্রীলোকের জল আনিবার কষ্ট দেখিয়া তিনি স্থির করেন, গ্রামে গ্রামে পুকুর কাটাইয়া দিবেন। তখন পুকুর কাটাইতে হইলে জমিদারের হুকুম লইতে হইত। কিন্তু জমিদারের হুকুম পাওয়া সহজ কথা ছিল না, আর পাইলেও তাহা শীঘ্র পাওয়া যাইত না। তাই গোবর্দ্ধন জমিদারের হুকুম না লইয়া গ্রামে গ্রামে পুকুর কাটাইতে আরম্ভ করেন। সে সব তো পুকুর নয়, এক একটা দীঘি। তাঁহার এই দীঘি কাটানোর কথা শুনিতে পাইয়া জমিদার পাইক পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যান এবং শাস্তি-স্বরূপ রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখেন। কিন্তু বহুক্ষণ প্রখর রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যখন গোবর্দ্ধন নিজের গোঁ ছাড়িলেন না, তখন জমিদার

সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিনা অনুমতিতে পুকুর কাটাইবার অধিকার দেন। *

এই অধিকার পাইয়া গোবর্দ্ধন, শুনিতে পাই, বিভিন্ন গ্রামে একশত আটটা দীঘি কাটান। সেই সব দীঘি এখনও বর্ত্তমান আছে। তবে সংস্কার অভাবে কিছু খারাপ হইয়া আসিতেছে।

তখন এইরূপ গোবর্দ্ধনের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। সামান্য গৃহস্থেও পুকুর কাটাইতে না পারুক রাস্তার ধারে গাছ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে একটা মস্ত পুণ্যের কায করিলাম বলিয়া মনে করিত।

বাস্তবিক, বিচার করিতে গেলে, এই সব কাযকে যদি পুণ্য কায না বলিব, তবে আর কোন্ কাযকে পুণ্য বলিব? কয়েক জন বামুনকে বা কুমারীকে খাওয়াইলেই যে পুণ্য হয়, তাহা নয়। আর যদিই বা হয়, সে পুণ্য অতি ছোট পুণ্য। পুকুর

* লোকের বিশ্বাস, গোবর্দ্ধনকে যখন প্রখর রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছিল, তখন একটা মেঘ হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া গোবর্দ্ধনের মাথার উপর দাঁড়াইয়া তাঁহাকে রৌদ্রের তাপ হইতে রক্ষা করে। ইহাতেই জমিদার বুঝিতে পারেন যে, গোবর্দ্ধন জলছত্র করিয়া দেবতা হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে বাধা দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়, দিলে তাঁহার নিজের ক্ষতি হইতে পারে। এইরূপ ভয়-ভক্তিতে তিনি গোবর্দ্ধনের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাকে পুকুর কাটানো সম্বন্ধে অপ্রতিহত অধিকার দেন।

কাটানো, পুকুর সংস্কার করানো প্রভৃতি কাযের পুণ্য উহার তুলনায় খুব বড় পুণ্য। আমরা এখন বুদ্ধির দোষে বড় পুণ্য ছাড়িয়া ছোট পুণ্য করিতে ছুটি। যত সস্তায়'পুণ্যি'সঞ্চয় করা যায়, সেই চেষ্টাতেই এখন আমরা ঘুরি। পুণ্য সঞ্চয় কিন্তু এত সহজ কথা নয়।

গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল রাখার দায়িত্ব প্রত্যেকের। যাহার পয়সা আছে সে পয়সা দিয়া আর যাহার গতর আছে সে গতর দিয়া এই দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে পারে। ফরাসীদের দেশে রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিবার জন্য দেশের সকলকেই সাহায্য করিতে হয়। এই সাহায্য তুমি পয়সা দিয়াও করিতে পার, গতর দিয়াও করিতে পার। তোমার যেমন ভাবে খুসী, তেমনি ভাবে সাহায্য কর। আমাদের দেশেও কি এইরূপভাবে সমবেত চেষ্টায় কায করিয়া গ্রামগুলির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটান কখন সম্ভবপর নয়? সম্ভবপর খুবই, তবে আমরা অলস, পয়সা না থাকিলেও গতর দিয়া খাটিতেও সঙ্কুচিত, একটা বৃথা অভিমানের ভয়ে একেবারে জড়সড়। আমরা যদি ঘর-পরের প্রকৃত সম্পর্কটা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই অভিমানের অবসরও থাকিত না, আলস্যও জন্মিত না। আমরা যদি ইচ্ছা করিয়া অন্ধ সাজি, তাহা হইলে কার সাধ্য আমাদিগকে দৃষ্টিশক্তি দান করে। ভগবানেরও বোধ হয় সে শক্তি নাই, অন্তত নাই বলিয়াই তো দেখিতেছি।

(১৭)

গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল করিয়া তুলিলেও শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না। পিতামাতার বিশেষত পিতার অসংযতভাবে ইন্দ্রিয়সেবার ফলে পিতা কখন কখন এমন কতকগুলি রোগ সঞ্চয় করিয়া বসেন যাহা বংশ পরম্পরাক্রমে থাকিয়া যায়।

এই সব পৈত্রিক রোগ হইতে সন্তানদিগকে রক্ষা করিবার উপায় কি? ডাক্তারেরা এ সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন এরূপ মনে হয় না। কোন কোন রাষ্ট্রে দেখা যায় যে যাহারা পাকা বদ্‌মায়েস তাহাদের জননশক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তাহাদিগকে সন্তানের জনক জননী হইতে দেওয়া হয় না। কিন্তু পাকা বদ্‌মায়েস না হইয়াও অনেকে নানা রোগ সঞ্চয় করিতে পারে ও করিয়া থাকে তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা?

জানি না, ঠিক্ কি ব্যবস্থা করিলে তাহাদের সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

তবে এই একটা কথা মনে হয়, যদি বাপ-মার মনে একটা কর্ত্তব্যপ্রীতি জাগাইয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও করিতে পারেন। তাঁহারা নিজেদের স্বাস্থ্য যদি ভাল রাখিতে পারেন,

তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যও কাজেকাজেই বিকৃত না হইবার সম্ভাবনা।

অসংযতভাবে ইন্দ্রিয় সেবা ছাড়া আরও এক উপায়ে আমরা নিজেদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদিগের স্বাস্থ্যও নষ্ট করিয়া বসি। তাহা মাদক-প্রিয়তা। আমরা এতদূর নেশাখোর হইয়া উঠিয়াছি যে, এমন পরিবার খুবই কম পাওয়া যাইবে, যে-পরিবারের মেয়েরা পর্য্যন্ত দোক্তা খাইতে না শিখিয়াছে। সে দিন আমার একবন্ধু বলিতেছিলেন, তাঁহাদের পাড়ার একটী ভদ্রপরিবারের মেয়েরা ছেলেদের দেখাদেখি কোকেন পর্য্যন্ত খাইতে শিখিয়াছে।

ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত তামাক সিগারেট খায়। আমার এক আত্মীয়ের বিশ্বাস ছিল, শিশুদিগকে মাঝে মাঝে দুই একটান তামাক খাওয়াইলে তাহাদের লিভারের দোষ কাটিয়া যায়, আর সেই বিশ্বাসের বশে তিনি তাঁহার শিশু পৌত্রদিগকে মাঝে মাঝে দুই এক টান তামাক খাওয়াইতেন। ছোটলোক বলিয়া পরিচিত শ্রমজীবিদের মধ্যে ছেলেমেয়ে সকলেই তামাক খায় আর ছেলেরা পাঁচ ছয় বৎসরে পড়িতে না পড়িতে তামাক টানিতে শিখে, লুকায়িয়া নয় বাপের বা মায়ের হাত হইতে হুকা কাড়িয়া লইয়া টানিতে শিখে।

গা ম্যাজ ম্যাজ করিতেছে, হাত পা কামড়াইতেছে ইত্যাদি

সত্যমিথ্যা নানা অছিলায় লোকে আফিম খাইতে শিখে। আফিম তো আজকাল বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিত্যসঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে।

ছোট লোকদের তাড়ি, ধেনোমদ, গাঁজা বেশ চলে, এইগুলি নাকি তেমন দোষের জিনিষ নয় !!

ভদ্র সমাজে গাঁজার প্রচার কিছু কম হইলেও মদের প্রচার যথেষ্ট। আবার অনেক যায়গায় মদের সহিত অফিমের নেশাও বেশ চলে।

গুলি ও চণ্ডুর নেশা কোথাও কোথাও খুব আছে।

যাহারা নিজেরা এইরূপ কোন নেশা করে, তাহাদের সন্তানেরা স্বভাবতই তাহাতে আসক্ত হয়। প্রথমে হয়ত লুকায়িয়া লুকায়িয়া নেশা করিতে শিখে ও শেষে প্রকাশ্যেই আরম্ভ করে।

দৃষ্টান্তের জন্য কাহাকেও বেশীদূরে যাইতে হইবে না, অনেকে নিজের বাড়ীতেই দৃষ্টান্ত পাইবেন, পাড়াতে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

এই মাদকস্পৃহা হইতে দেশটাকে রক্ষা করিতেই হইবে। জেলখানায় চোর-ডাকাতদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া এই বুঝিয়াছি যে অসংযত ইন্দ্রিয়সেবা ও মাদকস্পৃহা এই দুই শত্রুর হাতে পড়িয়াই তাহারা ক্রমে চোর ডাকাতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই এমন সব ভাল ভাল গুণ দেখিয়াছি, যে-সব গুণ আমাদের থাকিলে আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতে পারিতাম।

তাহারা সঙ্গদোষে, হয়ত বাড়ীতে গুরুজন বা আত্মীয়দের কুদৃষ্টান্তের ফলে নেশা করিতে শেখে, বেশ্যাবাড়ী যায়। কিন্তু এই দুইটী অপকার্যই সাজে যদি কাহাকেও তো সে কেবল ধনগর্ব্বিত অসংযত অহঙ্কারী আত্মসর্ব্বস্বকেই, অপর কাহাকেই নয়, গরীবকে তো একবারেই নয়। এই দুইটীর খরচা পোষাইয়া উঠা অসম্ভব হইলেই লোকে জুয়াচুরি করিতে শিখে। শেষে জুয়াচুরির সঙ্গে চুরি আসে। চুরিটা প্রথম প্রথম নিজের বাড়ীতেই হয়। বাড়ী থেকে আজ এই জিনিষটি চুরি যায়, কাল ঐ জিনিষটি চুরি যায়। এইরূপে চুরিতে হাত পাকিলে ও সাহস বাড়িলে, পাড়ায় ও শেষে বে-পাড়াতেও চুরি ডাকাতি করিতে উৎসাহ জন্মে। এমন বিনা পরিশ্রমে অর্থ উপায়ের সন্ধান একবার পাইলে অলসপ্রকৃতি নেশাখোর ও বেশ্যাসক্তেরা আর পরিশ্রম করিতে চায় না, চুরি ডাকাতিকেই অবলম্বন করিয়া সুখে দিন কাটাইতে প্রয়াস পায়। ইহার ফলে তাহাদের কেহ বা জেলে আসে আর কেহ বা শেষ পর্য্যন্তও পুলিশের চোখে ধূলি দিতে সমর্থ হয়। জেলে আসিয়া তাহাদের কোনরূপ সংস্কার হয় না, বরং আরও বহু চোর-ডাকাতের সংস্পর্শে থাকিয়া চুরি ডাকাতির নূতন নূতন পন্থা শিখিয়া লয়, গলার ভিতর 'খোপর' কাটিয়া ঘড়ি, চেন, আংটি, টাকা-মোহর প্রভৃতি সহজে লুকাইয়া রাখিবার পথ আবিষ্কার করে।

(১৮)

স্বাস্থ্য রাখিতে হইলে আর একটী জিনিষ চাই—তাহা পুষ্টিকর খাদ্য। আজকাল দেশে যেরূপ দারিদ্র্যদশা পড়িয়াছে তাহাতে পুষ্টিকর খাদ্যের কথা দূরে থাক পেটভরা খাদ্যই অনেকের মিলে না। ফলে শরীর আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বা অজীর্ণতা এবং থাইসিস বা যক্ষার যে এত বাহুল্য দেখা যাইতেছে, তাহার কারণই উপযুক্ত পরিমাণে সুখাদ্যের অভাব।

এই সুখাদ্যের অভাব আগে দূর না করিলে দেশের কোন সংস্কারেই হাত দেওয়া যায় না। আগে বাঁচিতে দাও, তারপর অন্য কথা। স্বামী বিবেকানন্দ তাই প্রায়ই বলিতেন—আগে খেতে দে পরে ধর্ম্মের কথা শুনাস্; অর্থাৎ ভরাপেটে ধর্ম্মের কথা লাগে ভাল, ধর্ম্মপথে চলাও সহজ হয়। যখন ক্ষুধার জ্বালায় লোকে অন্ধ হইতে বসে, তখন ক্ষুধা-প্রসমনের উপায় চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তাতেই তাহাদের মন বসে না। ক্ষুধায় অন্ধ হইলে ঋষি-প্রকৃতি ব্যক্তিদেরও পদস্খলন হয়।

তাই মনে হয়, চরিত্র রাখিতে হইলেও আগে পেটের জ্বালা নিবারণ করা দরকার। কিন্তু সে জ্বালা নিবারিত হয় কিরূপে?

কয়েকটী পথ খোলা আছে। যথা—ব্যবসায়, কৃষি, চাকরী ও কুলিগিরি।

ব্যবসায় বিভিন্ন প্রকারের। কোন ব্যবসায়ে বেশী মূলধন আবশ্যক হয়, কোন ব্যবসায়ে বা অল্প মূলধন হইলেই চলে।

যাহার মূলধন নাই, অথচ ব্যবসায়িক বুদ্ধি আছে, সে দালালি করিতে পারে।

কৃষিতেও অল্পবিস্তর মূলধন আবশ্যক। তাছাড়া, ক্ষেতও যোগাড় করিয়া লইতে হয়। তবে, ব্যবসায় অপেক্ষা এ কাযটি অনেক সহজ। যাহাদের আদৌ মূলধন নাই অথচ চাষের বুদ্ধি অথবা গতর আছে তাহারা কৃষাণের কায করিতে পারে। কৃষাণের কায করিয়া পরে চাষী হইতে পারে।

চাকরী অনেক রকমের আছে। বুদ্ধি, শিক্ষা ও কর্ম্মশক্তির তারতম্যে উপায়ের তারতম্য ঘটে। তবে চাকরীতে ঝুঁকি কম, অনেক সময় তা একেবারেই থাকে না। হুকুম তামিল করিতে পারিলেই যথেষ্ট।

তারপর কুলিগিরি। যাহাদের না আছে কোনরূপ বুদ্ধিবৃত্তি, না আছে কোনরূপ শিক্ষা, অথবা না আছে সহায়-সম্বল, তাহাদের কুলিগিরি ভিন্ন গত্যন্তর কি? পরের স্কন্ধে বসিয়া বসিয়া উদর পূর্ণ করা অপেক্ষা কুলিগিরি ঢের—ঢের বেশী ভাল কায, এত ভাল যে, তুলনাই হয় না। কুলি ইচ্ছা করিলে আত্মসম্মান বজায় রাখিতে পারে; কিন্তু পরান্নভোজী যে, সে-আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়াই পরের অন্ন খায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষার এমনই দোষ যে, আমরা লেখাপড়া শিখিয়াও, ঘটে বুদ্ধি ধরিয়াও পরের অন্ন অম্লানবদনে খাইতে একটুও লজ্জাবোধ করি না। সেটা যে কতদূর অপমান-

কর ব্যাপার সে ধারণা আমাদের মাথাতেই আসে না। যদি আত্ম-সম্মান-বোধ আমাদের প্রখর হইত, তাহা হইলে আমরা কুলিগিরি করিতেও ছুটিতাম তথাপি এই অপমানে সম্মত হইতাম না।

যখন অন্ন উপায়ের জন্য কাহাকেও বড় বেশী পরিশ্রম করিতে হইত না, কেবল সাধারণ ভাবে তত্ত্বাবধানই যথেষ্ট হইত তখনকার কথা যাহাই হউক, এখনকার দিনে—এই অতিকষ্টে অন্ন উপায়ের দিনে, এই জাতীয় উদ্বোধনের দিনে কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আত্মীয়ের স্কন্ধে বসিয়া খাইতে থাকা ঘোরতর লজ্জার কথা। যিনি খাইতে দেন তাঁহার পক্ষে নয়, যে খায় তাহারই পক্ষে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এরূপ লজ্জাজনক দৃশ্যের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কেবল একজনের কথা শুনিয়াছি যিনি দারিদ্র্যে পড়িয়া অপরের অন্নের কাঙ্গাল হওয়া অপেক্ষা স্ত্রী-পুত্রসহ কুলিগিরি করাও সম্মানজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং সেজন্য পথে বাহির হইতেও বসিয়াছিলেন। তবে হঠাৎ একটি জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পাওয়ায় তাঁহাকে আর কুলিগিরি করিতে হয় নাই।

খাটিবার ইচ্ছা থাকিলে অন্নের জন্য কাহাকেও পরের নিকট ভিখারী হইতে হয় না। অন্ন উপায়ের সহস্র সাধু পন্থা পড়িয়া আছে। যে-কোন একটী বাছিয়া লইতে পারা যায়।

কামারের কায, ছুতোরের কায তো ছোট কায নয়।

কেবলই যে কলম পিষিতে হইবে এমন কি মানে আছে? সংস্কারের বশে কলম পিষিতে ছুটি বটে, কিন্তু কলম পেষার উপায় বা সুবিধা যদি না থাকে, তাহা হইলে চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া কামারের কাযে ছুতোরের কাযে লাগিয়া যাওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কলম পিশিয়া যাহার অন্ন হয় না, সে কলম পিষিবে কেন? ইহাতে কোন্ যুক্তি লুকান আছে? যখন বাঁচিতেই হইবে, তখন যে-কাযে সহজে অন্ন আসে, যথেষ্ট পরিমাণে আসে, তখন সেই কাযই অবলম্বন করা উচিত।

তবে তোমার যাহাতে অন্ন আসে, আমার তাহাতে না আসিতে পারে। আমার যাহাতে অন্নের উপায় সহজ হয়, তোমার তাহাতে কঠিন হইতে পারে। এ অবস্থায় তোমার অন্নোপায় আর আমার অন্নোপায় এক নয়। বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার মুলে শিক্ষা, বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তির পার্থক্য রহিয়াছে। সুযোগ-সুবিধার পার্থক্যও যে একেবারে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না।

যদি কোন কায-বিশেষকে ছোট করিয়া না দেখি, যদি কার্য্য মাত্রের সহিত ছোট বড়র কোন নিত্য সম্বন্ধ না রাখি, তাহা হইলে এ-কায করিব না, ও-কায করিব না, এ-কাযে অপমান ও-কাযে অপমান,—এরূপ অপবোধ কখনই জন্মিবে না।

কেমন করিয়া কায করি না করি তাহা দেখিয়াই মান-অপমানের কথা উঠিতে পারে। যেখানে নিষ্ঠা আছে সেইখানেই

মান ; যেখানে নিষ্ঠা নাই সেইখানেই অপমান। নিষ্ঠাই মান-অপমানের মানদণ্ড।

এই মানদণ্ডের উপর ভর করিয়াই আর্য্যঋষিরা নিষ্ঠাবান্ ব্যাধকেও নিষ্ঠাহীন ব্রাহ্মণের উপরেও স্থান দিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠার দিক্ হইতে বিচার করিয়াই প্রাচীন আর্য্যকবি তপোক্লিষ্ট সন্ন্যাসীকে নিষ্ঠাবতী সতী রমণীর নিকট হীনশক্তি ও অবমানিত করিয়াছিলেন এবং শিক্ষার জন্য নিষ্ঠাবান্ ব্যাধের দ্বারে লইয়া গিয়াছিলেন।

এই প্রাচীন শিক্ষা আজ আমাদের নাই, নিষ্ঠার মর্য্যাদা আজ আর আমরা বুঝি না, তাই যেমন-তেমন করিয়া কায সারিতে পারিলেই, দিন কাটাইতে পারিলেই নিজেদিগকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া গর্ব্ব করি। এখন বুদ্ধিমান্ মানে ফাঁকিবাজ—নিষ্ঠাবান্ নয়!

এখন সেই তত বুদ্ধিমান্ যে পরকে ঠকাইয়া দু'পয়সা উপায় করিতে পারে, যে পরকে বিপদে ফেলিয়া নিজের স্বার্থ গুছাইয়া লইতে পারে। সেকালে কিন্তু নিষ্ঠাই ছিল বুদ্ধিমত্তার অপর নাম।

এই নিষ্ঠা আমাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে। এই নিষ্ঠার অধিকারী হইলে আমাদের অন্নের ভাবনা থাকিবে না, অন্ন-দেবতা আপনি আসিয়াই দ্বারে উপস্থিত হইবেন।

নিষ্ঠার অধিকারী যদি আমরা হই, তাহা হইলে পরান্নকে,

ভিক্ষান্নকে আমরা বিষবৎ জ্ঞান করিব, কুলিগিরির অন্নকে, মুদিগিরির অন্নকে, ছুতোরগিরির অন্নকে, কামারগিরির অন্নকে বহুমান্য বলিয়া মনে করিব। আর সেরূপ মনে করার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রেও বড় হইয়া উঠিব।

সেই বড়, যে চরিত্রবান্, যে নিষ্ঠাবান্। সেই ছোট, যাহার চরিত্র নাই, নিষ্ঠা নাই। চরিত্রের সঙ্গে নিষ্ঠার ও আত্মসম্মানবোধের নিত্যসম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের মধ্যে যে বিরোধ ঘটাইতে বসে, সে তার্কিক হইতে পারে, বুদ্ধিমান্ নয়। সেই বুদ্ধিমান্, যে চরিত্রবান্, নিষ্ঠাবান্ ও আত্মসম্মানবোধবান্।

(১৯)

অন্নের সংস্থান করা আর বহু অর্থের অধীশ্বর হওয়া এক কথা নয়। বহু অর্থের অধীশ্বর হওয়া আমাদের অনেকের ভাগ্যেই না ঘটিতে পারে, কিন্তু নিজের পায়ে ভর করিয়া অন্নের সংস্থান করা সকলেরই সামর্থ্যের ভিতর।

আমরা যদি অর্থটাকেই বড় করিয়া দেখি, উহার সার্থকতা যে কি তাহা ভুলিয়া যাই, তাহাহইলে অর্থ-অর্থ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিবই এবং বহু অর্থ উপায় করিতে পারিতেছিনা বলিয়া কেমন যেন হীনতা বোধ করিতে থাকিবই।

কিন্তু যদি মনে করি, অভাব-পূরণের সহজ ও সাধারণ উপায় বলিয়াই অর্থের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা, তাহা হইলে বহু অর্থের অধীশ্বর হইলাম না বলিয়া কোন দুঃখই জন্মিবে না।

গ্রাসাচ্ছাদন চালাইয়া ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় কিছু কিছু জমাইতে পারিলেই যথেষ্ট। কিন্তু সেজন্য বহু অর্থের আবশ্যক নাই। সেজন্য সামান্য যেরূপ অর্থের প্রয়োজন, পরিশ্রম করিলে তাহা সকলেই উপায় করিতে পারে। কিন্তু পরিশ্রম করা-না-করা আমাদের হাতের ভিতর।

অনেক সময়ই আমরা পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত থাকিয়াও অনাহারে বা অল্পাহারে দিন কাটাই। ইহার কারণ আর কিছুই নয়—বৃথা আত্মাভিমান। এই আত্মাভিমান আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। এই আত্মাভিমানই আমাদের নিজেদের মধ্যে ভেদের সৃষ্টি করে, এই আত্মাভিমান হইতে কাষের ভাল-মন্দ ছোট-বড় সম্বন্ধে একটা অপবোধ জন্মিয়া যায়। বৃথা আত্মাভিমানই আমাদের মৃত্যুর বীজ; উহাই সকল দুর্ব্বলতার, সকল সঙ্কীর্ণতার, সকল নীচতার কারণ-স্বরূপ।

আত্মাভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া আমরা যদি পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহাহইলে আমাদিগকে অন্নের জন্য আত্মসম্মান বর্জ্জন করিতে হয় না। যে কায সমাজের—দশের—উপকারে বা ব্যবহারে লাগে তাহাই ভাল কায। সেইরূপ যে-কোন কাযই তখন আমরা অম্লান বদনে করিতে পারি এবং করিয়া তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্নেরও সংস্থান করিতে পারি।

কিন্তু 'বড় মানুষ' হইব, ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিব, সকলকে বশ করিব—এইরূপ অপভাব যদি আমাদের

মনকে একবার পাইয়া বসে, তাহাহইলে আমরা আত্মসম্মান বজায় তো রাখিতে পারিবই না, অধিকন্তু নীচচরিত্র জুয়াচোর পর্য্যন্ত এবং স্থলবিশেষে চোর-ডাকাত এমন কি বিশ্বাসঘাতক পর্য্যন্তও হইতে সঙ্কোচ বোধ করিব না ; সঙ্কোচ বোধ করা দূরে থাক, সঙ্কোচটাকেই কাপুরুষতার, বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইব।

এইজন্যই সন্তানদিগকে এমনই করিয়া মানুষ করা উচিত যাহাতে অর্থের দিকে তাহাদের একটা অস্বাভাবিক টান না জন্মে। কিন্তু তাই বলিয়া 'অর্থং অনর্থং ভাবয় নিত্যং' করিতে শিখানও উচিত নয়। অর্থ নিজে অনর্থের কারণ নয়। সমাজে থাকিতে গেলে, দশের সঙ্গে ঘর করিতে গেলেই অর্থ চাই ; অর্থকে অনর্থ বলা সঙ্গীহীন বনবাসীরই সাজে, তোমার আমার নয়।

অর্থ চাই, তবে অর্থের খাতিরে অর্থ চাইনা, বড় মানুষী করিবার জন্যও অর্থ চাই না ; অর্থ চাই জীবনধারণের জন্য, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব দূর করিবার জন্য, নিজের ও পরের উপকারে লাগাইবার জন্য।

অর্থ তখনই সার্থক যখন তাহা লোকের প্রভু না হইয়া দাস হইয়াই থাকে, যখন তাহা সহজেই কাযে লাগিতে পারে, যখন তাহা কেবল সিন্ধুকেই বন্ধ হইয়া থাকে না বা বাবুয়ানি ও বড় মানুষিতে খরচ হয় না।

অর্থ তখনই অনর্থ যখনই তাহা মনকে পাইয়া বসে, যখন

তাহা লোককে অপথে কুপথে চালাইতে প্রোৎসাহিত করে, যখন তাহার যথাব্যয়ে সঙ্কোচ আসে, যখন অর্থই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড বলিয়া একটা অপবোধ জন্মিয়া যায়।

অর্থ চাই ; তবে বহু নয়, আবশ্যক মত, সঙ্গত মত। সঙ্গত মত অর্থ উপায় করিবার মত মানসিক বল সকলের নাই। তাহা শিক্ষা ও সাধনার বিষয়। সন্তানকে শিশুকাল হইতে সেইরূপ বলের অধিকারী করিতে না পারিলে, শিশুরও মঙ্গল নাই দশেরও মঙ্গল নাই।

বহু অর্থের অধীশ্বর হইলেই কেমন যেন একটা আভিজাত্য-বোধ আসেই আর সেই সঙ্গে অর্থহীন সাধুচরিত্র ব্যক্তিকেও অশ্রদ্ধা করিতে স্বতই প্রবৃত্তি জন্মে। অর্থের একটা নেশা আছে। সেই নেশার বশে অর্থবান্ মানুষ অর্থবান্ ভিন্ন অপর কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। অপরের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইবার জন্য, অপরের শক্তি নিজের স্বার্থে লাগাইয়া অপরকে নামমাত্র অর্থ দিয়া নিজেই সমস্ত গ্রাস করিবার জন্য তাহার মনের মধ্যে একটা উন্মাদনা আসে। তাহার এই উন্মাদনার ফলে সকলদেশেই ধনি-দ্বেষ জন্মিয়া যাইতেছে, সোসিয়ালিজ্‌মের—বলশেভিজ্‌মের প্রচার ও প্রাবল্য ঘটিতেছে।

সমাজকে সুস্থ রাখিতে হইলেই ধন-সাম্য রক্ষা আবশ্যক। একজন পরিশ্রমী হইয়াও কোনমতে গ্রাসাচ্ছদন করে আর এক জন সম পরিশ্রমী বা অল্প পরিশ্রমী হইয়াও বহু অর্থের অধীশ্বর

হয়, ইহা সকলে সহ্য করিতে পারে না। না পারিবার কারণ আছে। আমার শক্তি ও তোমার বুদ্ধি, অথবা আমার বুদ্ধি ও তোমার অর্থ একত্র হইয়া যে-ধনসৃষ্টি ঘটিতেছে, তাহা সৃষ্টি করা তোমার একারও সাধ্য নয় আমার একারও সাধ্য নয়, সুতরাং তাহাতে তোমার ও আমার সমান দাবী থাকাই উচিত। কিন্তু তুমি যদি স্বার্থ বা সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে চাকর বল ও নিজেকে প্রভু ভাব এবং আমাকে অতি সামান্য ভাগ দিয়া নিজেই সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া বস, তাহাহইলে প্রথম প্রথম কিছু মনে করিতে না পারি কিন্তু নিত্যই বৈষম্য ও অত্যাচার দেখিতে দেখিতে মন তিক্ত হইয়া উঠিবেই, সেই তিক্ততারই ফল ধনি-দ্বেষ।

সমাজের মধ্যে যদি এইরূপ দ্বেষ দেখা দেয়, তাহাহইলে সমাজের অমঙ্গলের কথা। এই দ্বেষই ঘর ও পরের মধ্যে একটা কৃত্রিম কিন্তু স্থায়ীভেদ সৃষ্টি করিয়া বসে। সুতরাং এই দ্বেষের কারণ যাহাতে না জন্মিতে পারে, এজন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা সহজ কায নয়।

আমরা যদি সকলেই নিজের নিজের সন্তানকে ধনসাম্যের মর্য্যাদা বুঝাই, তাহাহইলে যৌবনে তাহারা সম্ভবত কেহই সে শিক্ষার অমর্য্যাদা করিবে না। সম্ভবত ; কেননা সকলেই যে ঠিক ভাবে শিক্ষিত হইবে বা শিক্ষা গ্রহণ করিবে, এরূপ ভরসা কিছু কম। তবে চারিদিকের হাওয়া যদি বদলাইয়া দেওয়া

যায়, তাহাহইলে তাহাদের সংখ্যা কিছু কমিবেই এবং তাহাদের কার্য্যনীতিও কতকটা সংযত হইবেই।

ধনসাম্যবোধ জন্মিলেই অযথাব্যয়ে বা কৃপণতায় লোভ হইবে না। সেকালের ভারতীয় আর্য্যদের মত আমরাও ভাবিতে শিখিব, আমরা ধনের অধীশ্বর নই, ভাণ্ডারী মাত্র। এই ধন পরকে দিবার জন্যই ভগবান্ আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। আমি দেখিব, আমার আত্মীয়ের মধ্যে প্রতিবেশীর মধ্যে দেশ-বাসীর মধ্যে এমন যেন কেহ না থাকে যে অন্নের অভাবে মারা যাইতে বসিয়াছে, চিকিৎসার অভাবে কষ্ট পাইতেছে, বিদ্যার অভাবে মুর্খ থাকিতেছে। সকলকে বাঁচাইয়া রাখা, বিদ্বান্ করা আমার কায, তাহাতেই আমার অর্থের সার্থকতা।

পরকে যদি আপনার ভাবিতে ভুলিয়া যাই, তাহাকে যদি পরই ভাবিতে থাকি, তাহাহইলে ভাগ্যক্রমে বহুঅর্থের অধীশ্বর হইলে আমরা নিজের ও সমাজের হিতসাধক না হইয়া অহিত-সাধকই হই; কিন্তু যদি সে অপবোধ না থাকে, যদি পরকে সত্যসত্যই আপনার ভাবি, আপনার বলিয়া বিশ্বাস করি, পরের হিতের সহিত সন্তোষের সহিত—আমার হিত আমার সন্তোষ মিশিয়া আছে ইহা জ্ঞান করি, তাহা হইলে ভাগ্যক্রমে বহুঅর্থের অধিকারী হইলেও সেই অর্থ আত্মসাৎ করিবার জন্য, কেবল নিজের খেয়াল মত ব্যয় করিবার জন্য কখনই মনের মধ্যে সায় পাইব না। সেরূপ কায যে ঘোরতর অন্যায় কায, তাহা বারবার

মনে হইবে। মনে হইবে সেরূপ কায করিয়া আমি মহাপাপের অনুষ্ঠান করিতেছি।

অপর পক্ষে, কেবল নিজের জন্য নয় পরের জন্যও অর্থব্যয় করিতেছি, যথার্থ ভাবে ব্যয় করিতেছি, এইরূপ বিশ্বাস যদি থাকে, তাহা হইলে মনের প্রসারতার সঙ্গে প্রসন্নতাও বাড়ে, চরিত্রও দৃঢ় হয়, গীতোক্ত মুক্তির পথও সহজ হইয়া আসে।

(২০)

ধনসাম্যের কথা উঠিলেই সঙ্গে সঙ্গে উপার্জ্জন-প্রথার কথা আপনিই উঠিয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ভাবে ব্যবসায় ও শিল্প সাধনা চলিয়াছে, তাহাতে ধনসাম্য ঘটা একরূপ অসম্ভব। একজন নিজে বা কয়েকজন একত্র হইয়া কিছু মূলধন ফেলিল এবং অপর দশজনকে খাটাইয়া যাহা উপার্জ্জন করিল তাহার প্রায় সমস্তই নিজেরা রাখিয়া অতি যৎকিঞ্চিৎ সেই দশজনকে বাঁটিয়া দিল। ইহাতেই ধনবৈষম্য ঘটে।

কিন্তু সেরূপ না করিয়া যদি এমন হয় যে যাহার গতর আছে সে গতর দিয়া, যাহার বুদ্ধি আছে সে বুদ্ধি দিয়া আর যাহার অর্থ আছে সে অর্থ দিয়া একটি ব্যবসায় দাঁড় করায় এবং ঐরূপ সমবেত চেষ্টায় চালায় আর তাহাতে যাহা লাভ হইবে তাহা সমান অংশে ভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে কাহারও দুঃখ বা দ্বেষ করিবার কোন কারণ থাকে না এবং আপাতত ধনবৈষম্যও ঘটিতে পারে না।

আপাততঃ; কেননা সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি ভেদে এবং ব্যয়ের তারতম্যে পরে আবার ধনবৈষম্য ঘটিবেই। তবে তাহা তত ক্ষতিকর না হইতেও পারে।

ব্যয়-তারতম্যের ফলে যে ধনবৈষম্য ঘটে তাহা দূর করিবার একটি উপায় আছে। তাহা এই—যাহার যতটুকু আবশ্যক সে ততটুকু ব্যয় করিবে, তাহার বেশী ব্যয় করিবার, সুতরাং পাইবারও অধিকার তাহার থাকিবে না।

কিন্তু সেরূপ করিলে সঞ্চয়ের কথা ভুলিতে হয়। যখন কিছু বেশী পাইবে না তখন সঞ্চয় করিবে কি? কিন্তু সঞ্চয় না করিলে ভবিষ্যৎ বিপদ্ সম্বন্ধেই বা কি ব্যবস্থা? সে ব্যবস্থার ভার অবশ্যই সকলকেই সমান ভাবে লইতে হইবে। সকলের ব্যয় বাদে যাহা থাকিবে তাহা সাধারণের ধন বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে, দরকার মত সকলে তাহা হইতে অর্থ তুলিয়া লইয়া ব্যয় করিবে।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে যখন একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তখন ঠিক্ এই ভাব লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সকলে মিলিয়া উপার্জ্জন করিত, যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা সাধারণের ধন হইত, সে-ধন আবশ্যকমত সকলে ব্যয় করিত, ব্যয় বাদে যাহা সঞ্চিত থাকিত, তাহা কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি হইত না।

তখন অর্থ উপার্জ্জনের দুই সাধারণ উপায় ছিল, তাহা হয়

কৃষি, নয় ব্যবসায় বা শিল্পসাধনা। কৃষিতে গৃহস্থের বা পরিবারের সকলেই সমানভাবে—যাহার যাহার শক্তিমত—খাটিত ; ব্যবসায় ও শিল্পসাধনাতেও ঠিক তাহাই হইত।

এখানকার তথাকথিত একান্নবর্ত্তী পরিবারে ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা দেখা যায় না, তাই উহার প্রাণও নষ্ট হইয়াছে ; তাই এখন এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও কেহ কাহারও খবর রাখে না, একজন বৌ হয়ত অলঙ্কারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া রাখিয়াছে, আর একজনের গায়ে হয়ত একখানাও অলঙ্কার আছে কিনা সন্দেহ। এইরূপ বৈষম্য প্রকৃত একান্নবর্ত্তী পরিবারে শোভা পায় না। সে পরিবারে কোন প্রকার ভেদের কথাই থাকিতে পারে না। সে পরিবারে সকলের সম্বন্ধেই সমান ব্যবস্থা।

এইরূপ সমান ব্যবস্থা না থাকাতেই এখনকার একান্নবর্ত্তী পরিবার কলহের—হিংসার আবাসস্থল হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে সহানুভূতি নাই, সমানুভূতি নাই, ভেদের অভাব নাই, সেখানে প্রকৃত আত্মীয়তা থাকে না, জোর করিয়া রাখিতে চাহিলেও টেকে না। এরূপ ক্ষেত্রে পৃথক্ হইয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়—সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। সেরূপ পৃথক্ বাসে সংসারে শান্তি আসে এবং আত্মীয়দের মধ্যে স্বার্থ-সংঘর্ষ কমিয়া যাওয়ায় পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও টান থাকে।

কিন্তু পৃথক্ বাস মানেই ধনবৈষম্য স্বীকার। যদি ধন-বৈষম্য দূর করিতে হয়, তাহা হইলে যখন দশের সমবেত ও সহানুভূতিপূর্ণ

সাধনা ভিন্ন তাহা সম্ভবপর নয়, তখন প্রাচীন ব্যবস্থামত একান্নবর্ত্তী পরিবার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত। সেরূপ পরিবারে যে যত বেশী উপার্জ্জন করুক না, আর যে যত কমই উপার্জ্জন করুক না—কেহই অপরের অপেক্ষা বেশী ধনী বা বেশী গরীব হইবে না—সকলেই সমান থাকিবে।

আজকাল কৃষি, ব্যবসায় ও শিল্পসাধনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা চাকরী। চাকরীতে সকলের উপার্জ্জন সমান হইতে পারে না—কম বেশী হইবেই। কিন্তু অর্থলোভ না রাখিয়া সকলেই যদি নিজের নিজের উপার্জ্জিত অর্থ একত্র করিয়া একটি সাধারণ পারিবারিক ভাণ্ডারে পরিণত করে এবং পরস্পরের প্রতি স্নেহের ভাব, সহানুভুতির ভাব, আত্মীয়তার ভাব বজায় রাখিতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের পূর্ব্ব প্রাণ, পূর্ব্ব সার্থকতা ফিরিয়া আসে এবং সমাজ হইতে দারিদ্র্য-সমস্যাও বহু পরিমাণে কাটিয়া যায়। পৃথক্ হইবার—আত্মাভিমানে আহুতি দিবার, অসহিষ্ণুতা জাগাইয়া রাখিবার উৎকট চেষ্টা হইতেই আমাদের যত অন্নকষ্ট, যত দারিদ্র্য।

(২১)

কেবল সহানুভুতিপূর্ণ একান্নবর্ত্তী পরিবারের সৃষ্টি করিলেই যথেষ্ট হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পরিবারে মিলিয়া ক্রয় বিক্রয় ও উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে যৌথ কারবার খুলিতে

হইবে। যেখানে সম্ভব হইবে, সেখানে সকলে মিলিয়া একটি শিল্পকেন্দ্র খুলিবেন, সে কেন্দ্রের কর্ত্তা ও কর্ম্মচারী হইবেন সকলেই, তবে কার্য চালাইবার সুবিধার জন্য একজন বা কয়েক-জনকে পরিচালক হিসাবে মানিয়া চলিবেন। দশজন পরিবারে মিলিয়া ক্ষেত চষিবেন। এইরূপে দশটী পরিবার মিলিতে পারিলে, অসময়ে জলের অভাবে এবং অতিবৃষ্টি বা বন্যার সময় জলের আতিশয্যে কষ্ট না পাইবারই সম্ভাবনা। সকলের স্বার্থ একসঙ্গে গাঁথা থাকায়, সকলেই শস্য রক্ষার জন্য একসঙ্গে প্রাণপণ করিবেন। ফলে ক্ষেতমধ্যে কূপ কাটা, বিল কাটা এবং ক্ষেতের চারিদিকে খুব শক্ত বাঁধ দেওয়া কখনই অসম্ভব হইবে না। তাছাড়া, আবশ্যক হইলে কলকারখানার ব্যবহার করাও সম্ভবপর হইবে। ক্ষেত যদি বড় হয়, তাহা হইলে কলে চাষ করিয়া সুবিধা আছে। ছোট ক্ষেতে সে সুবিধা নাই।

এক একজন নিজের দরকার মত বাজার না করিয়া, যদি সকলে মিলিয়া ক্রয়-ভাণ্ডার খুলেন, তাহা হইলে একসঙ্গে বহু জিনিষ কেনার ফলে দর সস্তা পাওয়া যায় এবং ভাল জিনিষও পাওয়া যায়; অধিকন্তু অনেক বাজে পরিশ্রমও বাঁচিয়া যায়। ক্রয় ভাণ্ডার সকলের-হইয়া দ্রব্যাদি কিনিবেন, কিনিয়া সকলের আবশ্যক মত দ্রব্যাদি বাঁটিয়া দিয়া আসিবেন।

বিক্রয়কালেও সকলে আলাদা আলাদা বিক্রয় না করিয়া, একটি আড়তে জমা করিবেন এবং সেই আড়তের সাহায্যে

সুবিধামত বিক্রয় করিবেন। আড়ত যদি বিক্রয়ের ভার লয়, তাহা হইলে কাহাকেও বিক্রয়ের জন্য তাড়াতাড়ি করিতে হইবে না, সুতরাং অল্প দরে বিক্রয়ও করিতে হইবে না।

তাছাড়া, যাহারা কুমারের কায করে, যাহারা চাষার কায করে, যাহারা কামারের কায করে, যাহারা ছুতোরের কায করে, যাহারা কেরাণীগিরি করে, যাহারা কুলিগিরি করে—এইরূপ এক বৃত্তির সকলে যদি এক একটা সঙ্ঘ গড়িয়া তুলে এবং সঙ্ঘগুলি হইতে প্রতিনিধি লইয়া যদি একটি ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ, একটি শ্রমিক-সঙ্ঘ, একটি কৃষক-সঙ্ঘ, একটি শিল্পী-সঙ্ঘ স্থাপন করে, তাহা হইলে জীবন-সংগ্রামে রক্ষা পাওয়া খুবই সহজ হইয়া উঠে। সঙ্ঘ তাহার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বা ব্যষ্টিদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিবেই; ফলে কোথায় কিরূপ সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার যেমন খবর রাখিবে, তেমনি কোথা হইতে বিপদের সম্ভাবনা সেই সংবাদটী লইতেও ভুলিবে না। সমবেত চেষ্টার ফলে সকলেই রক্ষা পাইবে, সকলেরই উন্নতি হইবে।

এইরূপ ব্যবস্থা ছাড়াও সমবেত চেষ্টার ফলে এমন একটি সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে হইবে, যে সঙ্ঘের কায হইবে, দ্রব্যাদি স্থানান্তরীকরণ অর্থাৎ এক স্থানের জিনিষ অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া, যাইয়া ব্যবসায়ের সুবিধা করা। এই সকল কায ছাড়া আরও একটি প্রধান কায আছে। তাহা হইতেছে—লোকের

সুবিধা ও প্রয়োজন বুঝিয়া দেশের স্থানে স্থানে কৃষি-ব্যাঙ্ক, শিল্প-ব্যাঙ্ক, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক ও শিক্ষা-ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন। কৃষি-ব্যাঙ্কের টাকা কৃষির উন্নতিতে, শিল্প-ব্যাঙ্কের টাকা শিল্পের উন্নতিতে, সঞ্চয়-ব্যাঙ্ক ও শিক্ষা-ব্যাঙ্কের টাকা দেশের নানা লোকহিতকর কাযে ব্যয়িত হইবে। শিক্ষা-ব্যাঙ্কের যে টাকা তাহাতে কাহারও স্বত্ব থাকিবে না, তাহা সকলের দানের দ্বারা পুষ্ট হইবে, কিন্তু তাহা বিশেষ ভাবেই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ও আতুরদিগের পালনের জন্যই—ব্যয়িত নয়—ব্যবহৃত হইবে। ব্যবহৃত হইবে এইজন্য বলিতেছি যে, যাহাদিগকে শিক্ষা বা আশ্রয় দেওয়া হইবে তাহারা সাধ্যমত কিছু কিছু অর্জ্জন করিবে এবং তাহাদের অর্জ্জিত ধনের সবটা বা কতকটা ব্যাঙ্কের সুদ বলিয়া ব্যাঙ্কে জমা হইতে থাকিবে।

এইরূপ সকল কাযের জন্যই আমাদিগকে দল বাঁধিতে হইবে, দল বাঁধিয়া কায করিতে হইবে। শিশুদের সাহিত্যিক শিক্ষার সহিত শৈল্পিক শিক্ষাকে একটি অচ্ছেদ্যসূত্রে বাঁধিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে পরিণামে পরের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থও সিদ্ধ হইবে, ঘর-পরের আত্মীয়তা চির বজায় থাকিবে।

আমাদের প্রাচীন সমাজে এইরূপ নির্ভরশীলতার ভাব খুব প্রবল ছিল। তখন কেহ কাহাকেও ঠেলিয়া আলাদা হইয়া দাঁড়াইতে চাহিত না। তখন সকলেই মনে করিত, আমার সহিত তাহারও স্বার্থ জড়িত, সুতরাং তাহার হিত দেখিতে আমি

বাধ্য। ফলে তখন ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, পরিবারে-পরিবারে বেশ একটা আত্মীয়তার ভাব ছিল, সেই আত্মীয়তার ফলেই ব্রাহ্মণের ছেলে বাগ্দীর ছেলেকে দাদামশায়, জ্যেঠামশায় বলিয়া ডাকিতে কখনও লজ্জাবোধ করিত না, আর বাগ্দীর সন্তানও ব্রাহ্মণের ছেলেকে নিজের আত্মীয় ভাবিয়া সেইরূপ আত্মীয়তা দেখাইতে সঙ্কোচবোধ করিত না। এসব স্বপ্নকথা নয়। আমরা নিজেরাও এইরূপ দৃশ্য দেখিয়াছি। এখনও কোথাও কোথাও এইরূপ দৃশ্য দেখা যায়।

বল্‌শেভিকেরা যে সাম্যের স্বপ্ন দেখে, আমাদের সমাজে তাহা নির্ভরশীলতার গুণে বাস্তবচিত্র ছিল। তবে ছোট-বড় ভাব যে একেবারে ছিল না, তাহা নয়। তবে তাহার মধ্যে মারাত্মক ভেদ ছিল না, তাহার মধ্যে ঘৃণার বেড়া ছিল না। আমরা এখন পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে সেই ঘৃণার বেড়া—মারাত্মক ভেদের বেড়া সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছি, ছোট-বড়র মধ্যে আত্মীয়তার যোগসূত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি।

তখন ছোট-বড়র যে ভেদটা ছিল, এখন আমাদিগকে সে ভেদটাও দূর করিতে হইবে। এখন সমাজে কার্য্যভেদে কেহই ছোট কেহই বড় থাকিবে না, সকলেই সমান হইবে, সকলের মধ্যেই আত্মীয়তার একটি যোগসূত্র থাকিবে, সকলেই পরস্পরকে সাহায্য করিবে, সহানুভূতি করিবে।

এখন ছোট-বড়র যে ভেদ হইবে, তাহা সামাজিক নয়,

ব্যক্তিগত। যাহার চরিত্র যে পরিমাণে উন্নত, সে সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা পাইবে, তা' সে বংশে মুচিই হউক, চণ্ডালই হউক, আর বামুনই হউক।

ঠিক্ এইরূপ আদর্শে আমরা যদি নিজেদিগকে ও নিজেদের শিশুদিগকে গড়িয়া তুলি, তাহা হইলে কেবল অন্নাভাব কেন, অনেক অভাবই একেবারে দূর হইয়া যাইবে, আমরা আবার আমাদের সর্ব্ববিধ শ্রেষ্ঠত্ব ফিরিয়া পাইব, মানুষ বলিয়া, বীর বলিয়া, ভাবুক বলিয়া জগতের সমক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিব।

(২২)

ফলকথা, আমাদিগকে মানুষ হইয়া উঠিতে হইবে। মানুষ হওয়া মানেই ঘর-পরের পার্থক্য বিস্মৃত হওয়া, পরকে আপনার করা, তাহার সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখ, তাহার হিতাহিতকে নিজের হিতাহিত করিয়া তোলা।

আমরা মানুষ হইব। কিন্তু তাহা হইতে হইলেই আমাদিগকে ভারতের প্রাচীন ভাবের সহিত—আদর্শের সহিত যোগ রাখিতেই হইবে। প্রাচীনের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আমরা দাঁড়াইতে পারি না। প্রাচীনকালে আমরা যাহা করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই আমাদের ভবিষ্যতের ভরসাস্থল হইবে। প্রাচীনকে অস্বীকার করিলে আমরা মনে কখনই বল পাইব না।

কিন্তু প্রাচীন মানে প্রাচীনকালের ভালমন্দ সব নয়। মন্দটা বাদ দিয়া ভালটা বাছিয়া লইতে হইবে।

প্রাচীনকে মানিব বলিয়াই যে দেশের ও বিদেশের নূতন ভাব ও আদর্শগুলিকে অশ্রদ্ধা করিব, তাহা নয়। তাহা করিতে চাহিলে আমরা জগৎছাড়া হইয়া যাইব। জগতের সহিত যোগ রাখিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

অর্থাৎ প্রাচীন ও বর্ত্তমানে যেখানে যেটুকু ভাল পাইব তাহাই আমরা জীবন-পথের সম্বল করিয়া লইব।

এই জন্যই গীতাও পড়িব, রাষ্ট্রবিজ্ঞানও পড়িব, সমাজতত্ত্ব পড়িতেও ভুলিব না। টলষ্টয়ের শাসনতত্ত্ব-বিরোধ-বাদটা যে কি তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিব আর সেই সঙ্গে কার্লমার্ক্সের কল্পিত আদর্শ সমাজটারও ভালমন্দ উভয়দিক্ দেখিতে সঙ্কুচিত হইব না।

বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশে যে সব চিন্তার ধারা চলিয়াছে, সে সকলের কারণ ও পরিণতি বুঝিতে চেষ্টা করিব। জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির-ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া, বুঝিতে চেষ্টা করিব—জগৎটাকে মায়া বলিয়া বাস্তবিকই উড়াইয়া দেওয়া যায় কিনা এবং দিতে গেলে তাহার পরিণাম অতিমাত্র ভীষণ হয় কিনা; বুঝিব—দেশের উন্নতির সহিত, জাতির উন্নতির সহিত যেমন আধ্যাত্মিক সাধনার যোগ আছে তেমনি লৌকিক সাধনারও যোগ আছে। লৌকিক সাধনা মানে—শৈল্পিক বা আর্থিক সাধনা,

সাহিত্যিক সাধনা, শারীর সাধনা (বা ব্যায়াম), রাজনীতিক সাধনা। এই সকল লৌকিক সাধনাকে অগ্রাহ্য করিলে কোন জাতিই যে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে না, তাহা বিবিধ দৃষ্টান্তের সাহায্য আমরা বুঝিব, বুঝিয়া জীবনগতি স্থির ও নিয়মিত করিব।

রাজনীতিক সাধনা অতি কঠিন সাধনা। সে সাধনায় যথেষ্ট মানসিক বল না থাকিলে স্থির ভাবে লাগিয়া থাকা চলে না। লৌকিক অপর সাধনাগুলির মধ্যে নৈরাশ্যের নানা কারণ মাঝে মাঝে ঘটিলেও জীবনহানির আশঙ্কা নাই, কারাবাসের সম্ভাবনা নাই; রাজনীতিক সাধনায় সে আশঙ্কা, সে সম্ভাবনা খুব বেশী আছে। অথচ ইতিহাসের সাহায্যে দেখিব—রাজনীতিক সাধনাকে বাদ দিয়া কোন সমাজই, কোন জাতিই, কোন দেশই নিজের মর্য্যাদা, নিজের শ্রেষ্ঠতা বজায় রাখিতে পারে নাই, বরং অনেকস্থলে নিজেদের দাঁড়াইবার স্থানটুকু হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে।

আমাদের সামনে যে সাধনা-ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, তাহাতে রাজনীতিক সাধনার স্থান রহিয়াছে। সে সাধনাকে আমরা কোন মতেই ত্যাগ করিতে পারি না, কারাবাস বা জীবনহানির আশঙ্কাতেও পারি না।

যাহারা মনে করে, কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার বলেই দেশের যথার্থ উন্নতি ঘটিবে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করি, য়ুদীরা দেশচ্যুত

হইয়া বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া মরিতেছে কেন? আর আমরাই বা বারবার পরজাতির পদ শিরে ধরিয়া ধন্য হইতেছি কেন?

আধ্যাত্মিক সাধনা চাই, কিন্তু সে সাধনার ফল কেবল মনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিলেই চলিবে না, তাহা কর্ম্মের মধ্যে প্রকাশিত করা চাই, অর্থাৎ নিত্যকার জীবনের সহিত তাহার একটা সত্যকার যোগ রাখা চাই।

সে যোগ রাখিতে হইলেই মানুষকে স্বপ্ন ত্যাগ করিয়া বাস্তবতাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবেই আর বাস্তবতাকে স্বীকার করিলেই লৌকিক সাধনায় বিশেষত রাজনীতিক সাধনায় ভাল করিয়াই লাগিতে হইবে।

রাজনীতিক সাধনাকে আমরা কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারি না, অবশ্য যদি বাঁচিতে চাই, জগতের মধ্যে মানুষ বলিয়া দাঁড়াইতে চাই। আমরা যে বাস্তবিকই চরিত্রবান্, বাস্তবিকই মানুষ, তাহার পরিচয় তখনই, যখনই আমরা সকল বিপদকে সকল আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করিয়া স্থিরলক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া যাইতে পারিব, যখন কারাবাসের বা প্রাণহানির ঘোর সম্ভাবনাও আমাদিগকে সাধনাচ্যুত করিতে পারিবে না।

মানুষ মানেই সম্পূর্ণ মানুষ, মুক্তি মানেই সম্পূর্ণ মুক্তি, যাহার কোন-একদিকের সাধনা বাকি আছে তাহার সিদ্ধি লাভ হয় নাই, তাহাকে তাহা অর্জ্জন করিতেই হইবে। যতদিন সে তাহা না করিবে, ততদিন তাহার পূর্ণমুক্তি নাই, পূর্ণ উন্নতি নাই,

পূর্ণ মনুষত্ব নাই। আমরা চাই মানুষ হইতে, পূর্ণ মানুষ হইতে, পূর্ণ মুক্তি পাইতে, কোন একদিকের অপূর্ণ সিদ্ধি লইয়া সন্তুষ্ট হইতে নয়।

তবে এস আমরা ঘর-পরের কৃত্রিমভেদটা—পার্থক্যটা ভুলিয়া যাই, যাইয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া, পরস্পরকে সাহায্য করিতে করিতে উন্নতির পথে, সাধনার পথে, মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হই, হইয়া নিজেদিগকে—নিজেদের জীবনকে, কার্য্যকে, চিন্তাকে, আদর্শকে ধন্য করি।



গ্রন্থকারের

শিখগুরু গোবিন্দসিংহ।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

(সচিত্র) যন্ত্রস্থ।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গবেষণাকারী শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন—

আপনার গুরুগোবিন্দ পড়িয়া সুখী হইলাম। বাঙ্গলায় আদিম ও প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইতিহাস লেখা একটি সুমহৎ এবং স্থায়ী মূল্যের কার্য্য। ইহাতে আপনি বেশ সফলতা লাভ করিয়াছেন। বইখানিও সুখপাঠ্য হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল বাঙ্গলা লেখক লেপল গ্রিফিণের রণজিতসিংহ ও কানিংহামের গ্রন্থ সম্বল করিয়া "ঐতিহাসিক" প্রবন্ধ রচনা করিতেন, তাঁহারা আপনার "গুরুগোবিন্দে" প্রকৃত আদর্শ দেখিবেন এবং থমকিয়া যাইবেন, এরূপ আশা করা অন্যায় হয় না।

"ধর্ম্মে" অরবিন্দ বাবু বলিয়াছেন—

তাঁহার পুস্তক (শিখগুরু গোবিন্দসিংহ) পাঠে খালসা সংস্থাপক স্বদেশহিতৈষী মহাবীরের উদার চরিত্র ও অদ্ভুত কার্য্যকলাপের দিকে মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। যাঁহারা দেশের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন বা করিতে ইচ্ছুক হন, এই জীবনী তাঁহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিবে ও ঐশ্বরিক প্রেরণা দৃঢ়ীভূত করিবে।